আমরাই এনেছি বিজয়

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা পর্ব-৪

◀ সংকলক ও সম্পাদক ▶

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক : **মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)**
বি.এস.এস. (অর্থনীতি); এম.এস.এস. (জাঃবিঃ)
০১৭ ১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৩৬.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব © : মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : তারিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : আফরোজা পারভীন লাকি

অলংকরণ : মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

ISBN : 978-984-91094-7-1

সৌজন্য

নতুন প্রজন্মের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ এর কর্মকাণ্ডের অংশ।

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এবং

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস।

মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষণ নেই। কিন্তু তারা বাঙ্গালি, জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আর এই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধারই আছে আলাদাা আলাদা অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা দিনপঞ্জি ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। কালের গহ্বরে অনেকেই আজ বিলীন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের আমরা ক'জনইবা চিনি অথবা তাঁদের খোঁজ রাখতে পারি? এঁরাও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যান্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

"মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ" স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩,২৭০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা" সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাঁথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন
সভাপতি ও উদ্যোক্তা (মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)
মোবাইল: ০১৭১৫৪৪৮৪২৮
Facebook: মাসুদুল করিম অরিয়ন
Youtube: MISC BD

সূচি

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজ আলম বেগ, বরিশাল	৭-১৪
২	বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার	১৫-১৮
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মিজানুর রহমান, নারায়নগঞ্জ	১৯-৩০
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, বরিশাল	৩১-৩৭
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার	৩৮-৫৬
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা এহসান কবির রমজান, নারায়নগঞ্জ	৫৭-৬৪
৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ শওকত হোসেন, বাগেরহাট	৬৫-৬৭
৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম নান্নু, বরিশাল	৬৮-৭৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাহফুজ আলম বেগ
বরিশাল

সাব-সেক্টর কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর

আমার পিতা প্রফেসর হোসাম উদ্দিন, বরিশাল বি.এম. কলেজের নামকরা প্রফেসর ছিলেন। মায়ের নাম মর্জিনা বেগম। পৈতৃক বাড়ি ভারতের মালদহ হলেও ১৯২০ সাল থেকেই বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন আমার পিতা। ৭ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে আমি পঞ্চম। আমার বড় ভাই মাহমুদ আলম বেগ ছিলেন ব্যাংকার। আর মেঝ ভাই মঞ্জুরুল আলম বেগ একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশের প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার। আমার কমান্ডো ট্রেনিং হয় চিরাটে, পাকিস্তান কমান্ডোদের হেড কোয়ার্টারে। বিভিন্ন বাহিনী থেকে ট্রেনিং নিতে আসা ৫০০ জন থেকে কোয়ালিফাই করে মাত্র ১৫ থেকে ২০ জন। ওটা ছিল কমান্ডোদের বেসিক ট্রেনিং। এরপরই একেকজন একেক বিষয়ে স্পেশাল ট্রেনিং নেই। আমি ছিলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এসএসজি)-এর একজন এলিট কমান্ডো। করাচিতে বাঙালি গ্রুপ ছিল আমাদের। আমাদের সাথে কামাল সাহেব ছিলেন, পরে তিনি আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হন। ছিলেন সুলতান সাহেবও। উনিও আমেরিকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত কমান্ডো। একাত্তরে ক্যাপ্টেন সুলতান নামে নাইন সেক্টরের ইনডাকশন ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন। আর নূর মোহাম্মদ ক্যাপ্টেন বাবুল নামে ট্রুপর্স সহ নানা অনুষ্ঠান পালন করতাম। দেশ তখন উত্তপ্ত। আমাদের মধ্যে কিছু ইন্টেলিজেন্সের লোকজন ছিল। তাদের মুখেই শুনতাম পূর্ব পাকিস্তানে কিছু একটা ঘটবে। তখন উদগ্রীব হতাম। চিন্তা হতো দেশকে নিয়ে। আন্ডার ওয়াটার ফিশিং করার ঝোঁক ছিল আমার। একদিন

করাচি নেভাল পোর্টে ফিশিং করতে গিয়ে দেখি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা জাহাজে হেভি আর্মস অ্যামুনেশন লোড করা হচ্ছে। তখনই বুঝে যাই ওরা খারাপ কিছু ঘটাবে। কিন্তু কমান্ডো হয়ে তো বসে থাকতে পারি না। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। কয়েকদিনের ছুটিতে দেশে আসি। সুলতান সাহেব ও নূর মোহাম্মদ ভাই ইতিমধ্যে অবসরে, ফিরে এসেছেন। তাদের সঙ্গেই মিটিংয়ে বসি। পরিকল্পনা হয় খারাপ কিছু ঘটার আগে তারাই করাচিতে আমাকে মেসেজ পাঠাবেন। ফিরে এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবো। ছুটি কাটিয়ে পাকিস্তান ফিরে গেলাম। হঠাৎ একদিন কমান্ডিং অফিসার টি এ খান একটি টেলিগ্রাম হাতে ছুটে আসেন। টেলিগ্রামে লেখা 'মাদার সিরিয়াস কাম শার্প।' বুঝে গেলাম এটি নূর মোহাম্মদ ভাই পাঠিয়েছেন। 'মাদার' মানে মাতৃভূমি। আর 'সিরিয়াস' লিখলে বুঝতে হবে যেভাবেই হোক ফিরে যেতে হবে। টি এ খান ছুটি দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত রাখলাম। 'মায়ের চেয়ে দেশ আগে' এমন উত্তর শুনে অবাক হয়ে উনি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পালিয়ে যাব এটা বুঝতে দিলাম না তাকে। কারণ ওরা নানাভাবে আমাদের সন্দেহ করতো। ফরমাল ছুটি না নিয়ে পালানোর পরিকল্পনা আঁটছি। টাকার প্রয়োজনে শখের মটরসাইকেলটাও বিক্রি করি নয়শ টাকায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অলি। দেশ নিয়ে সেও চিন্তিত। পরিকল্পনার কথা শুনে তার অন্তসত্তা স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলো। রাজি হলাম। কিন্তু প্লেনের টিকিট তো নাই। অলরেডি পাকিস্তান থেকে লোকজন আসা বন্ধ। শুধু হাজীদের ফ্লাইট ওপেন ছিল। কি করি? তখন মনে পড়ে লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজের কথা। পাকিস্তানের বাইশ ফ্যামিলির, ধনী পরিবারের সন্তান। চিরাটের ট্রেনিংয়ে আমি ছিলাম তার ট্রেনার। ওই সময় সে প্রায় ৬০ ফিট পানির নিচে চলে যায়। ফলে আনকনশাস অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিলাম। সেই থেকেই পরিবারিকভাবে একটা বিশ্বস্ত সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে। পাঞ্জাবি হলেও তার কাছেই সাহায্য চাইলাম। সেও সবকিছু গোপন রেখেছিল। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে চাকরি করতেন তার এক আত্মীয়। তার মাধ্যমে দুটো টিকেট জোগাড় করে দেন ইমতিয়াজ। রাত দু'টার ফ্লাইটে পাকিস্তান থেকে রওয়ানা হয়ে ৪ মার্চ ১৯৭১ তারিখ ভোরে পৌঁছাই ঢাকায়।

আমার ছোট ভাই মাহবুব আলম বেগ তখন ছাত্রলীগ করতো। তোফায়েল আহম্মেদসহ তৎকালীন ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। তাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন 'তুই যা বললি সেটা আমি জানি। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে সেলিমদের সাথে মিশে থাকবি। সেলিম তোকে বলবে তোর কি করতে হবে। বুঝলাম বঙ্গবন্ধু নিজেও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাত মার্চ ভাষণের পর শেখ সেলিম ও কিছু ছেলেসহ আমরা নারায়গঞ্জে একটা বাড়িতে আস্তানা গাড়ি। সেখানে পেট্রোল আর সাবান এনে মনোটল ককটেল বানানো শুরু করি। অসহযোগে ঢাকায় ও আশপাশে যত ককটেল ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো অধিকাংশই ছিল নারায়নগঞ্জের। এরপর বলা হলো কলাতিয়া চলে যেতে। ওখানে গগনদের বাড়িতে ক্যাম্প করতে হবে। যদি কোন ঘটনা ঘটে বা পাকিস্তানিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে নেতারা কলাতিয়াতে আশ্রয় নিবেন। আমার দায়িত্ব তাদের সেভ ডেসটিনিতে পাঠিয়ে দেওয়া। গগন ছিল ওখানকার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। তার বড় ভাই গ্রামের চেয়ারম্যান। সেখানে গিয়েই ক্যাম্প করলাম। ট্রেনিং দেওয়াও শুরু হয়। বাড়ির সামনে ছিল একটা পুকুর। পুকুরের ওপারে বোতল রেখে গুলির ট্রেনিং দিতাম। অস্ত্র ছিল একটা পয়েন্ট টু টু রাইফেল। ওখানে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, রাজ্জাক সাহেব, সিরাজুল আলম খান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, শেখ ফজলুল হক মনি, আমেনা বেগম, মন্টু, আরেফ প্রমুখ। ধীরে ধীরে আমরা স্থানীয়দের বন্দুক সংগ্রহ করা শুরু করি। জয়দেবপুরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা তখন বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। একদিন ক্যাম্পে আসেন আ স ম আব্দুর রব। সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫ জন সেনা। তাদের কাছে ছিল একটা চাইনিজ এসএমজি আর চারটা চাইনিজ রাইফেল। তখনই প্রথম মর্ডান আর্মস পাই। ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হলে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাই নরসিংদীতে, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের গ্রুপে। শিল্পী আপেল মাহমুদও ছিলেন ওখানে। পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা থেকে তারাবো দিয়ে নরসিংদীর দিকে অ্যাডভান্স হচ্ছে। তখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ঠেকানোর। একটা দল নিয়ে আমি এগিয়ে যাই অ্যাম্বুশের জন্য। প্রথম অ্যাটাকেই পাকিস্তানি সেনাদের

দুটি ট্রাক রাস্তার দুদিকে পড়ে যায়, হতাহত হয় অনেক সেনা। কিন্তু পরদিনই আমরা ফুলফেইজে বোম্বিং করে অ্যাডভান্স হই। ফলে টিকতে পারি না আমরা। আমরা ফিরে এসে দেখি ডিফেন্স নাই। তখন যে যার মতো আত্মোগোপনে চলে যাই। আমি নৌকায় করে চলে যাই লৌহজং। সেখান থেকে একটা লঞ্চে ফিরি নিজ শহর বরিশালে। বরিশাল গিয়েই ছাত্রদের ত্রিশজনের একটা গ্রুপকে রাইফেল ট্রেনিং দেওয়া শুরু করি। চিফ হুইপ ফিরোজ, আফজাল, প্রফেসর সালাম এরাও ছিলেন ওখানে। ইছাকাঠি গার্ডেন, কাশিপুরে ট্রেনিং করাই। জায়গাটা ছিল লাকুটিয়া জমিদার বাড়ির একটা মাঠে। তিন চারদিন পরেই বরিশালে পাকিস্তান আর্মিরা আসে। প্যারাটুপারসও ল্যান্ড করে। হেভি মেশিনগানের সামনে আমরা টিকতে পারি না। তখন ট্রেইন্ড লোক খুব কম ছিল। জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান ছিল একাত্তরের সবচেয়ে বড় অস্ত্র প্রথম দিকে সবাই ছিল আইডিওলজিক্যাল ফ্রিডম ফাইটার। যারা বুক দিয়ে বিশ্বাস করতো বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। পাকিস্তানি সেনারা বরিশাল দখল করলে আমরা চলে যাই আটঘর কুড়িয়ানায়। পেঁচানো খাল আর পেয়ারাবাগান ওখানে। চলাচলের জন্য 'হাক্কা' ছিল একমাত্র উপায়। বরিশালের ভাষায় 'হাক্কা' হলো একটি বাঁশ। একটি বাঁশ দিয়ে তৈরি পুল দিয়েই চলাচল করতে হতো। ফলে বুট পরে তার ওপর দিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। এসব কারণে জায়গাটা আমাদের জন্য নিরাপদ ছিল। তবুও পাকিস্তানি সেনারা গানবোট নিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করতো। রমা দাস, বিথিকা রাণী বিশ্বাস, সমিরন, হরিমন বিশ্বাসসহ আরও অনেক মেয়ে ওখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। অধিকাংশই ছিল কলেজের ছাত্রী। এছাড়া সেখানে ছিল পরিমল, ভুলু, তারেক প্রমুখ। আমাদের কাছে দুইটা স্টেনগান, ত্রিশটার মতো রাইফেল। তা দিয়েই যতটা সম্ভব ঠেকিয়েছি। রাজাকার বাহিনীও মাঠে নেমেছে তখন। ছোটখাট যুদ্ধও চলেছে। এক সময় অস্ত্রের সংকটে পড়ি। তখন নির্দেশ আসে ছোট্ট ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে ইন্ডিয়ায় চলে যাওয়ার। ফলে সবাইকে ট্রেনিংয়ের জন্য ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দিই। পরিকল্পনা করি বোনের সঙ্গে দেখা করে রাজশাহী হয়ে মালদহে ঢুকবো। বোনের শশুড়বাড়ি ছিল কানসাটে। সেখানে বর্ডার ক্রস করতেই প্যাচানো গোফ দেখে পাকিস্তানি স্পাই ভেবে বিএসএফ

আমাকে থানায় নিয়ে যায়। পরে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অফিসে যাই। প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা ফণিভুষণ মজুমদার আমাকে নাইন সেক্টরের হেডকোয়ার্টার হাসনাবাদে যাওয়ার পরামর্শ দেন। নাইন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। তিনি আমাকে পেয়ে খুশি হন এবং ঐ দিনই ট্রেনিং থেকে আসা একটি কোম্পানির দায়িত্ব দেন । ভারতের বসন্তপুরের পাশে বর্ডারে রাইস মিলে প্রথমে ঘাঁটি গাড়ি। সামনে নদী ওপারে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প। আমার গ্রুপে প্রথম দুইশজন মুক্তিযোদ্ধা থাকলেও পরে তা বেড়ে দাড়ায় পাঁচশতে। নাইন সেক্টরের অপারেশনাল কমান্ডারও ছিলাম আমি। পরে আমাকে শমশেরনগর সাবসেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমগ্র সাতক্ষীরা অঞ্চলে গেরিলা, সম্মুখ ও নৌ কমান্ডো যুদ্ধসমূহ পরিচালনা করি আমি। এছাড়া বরিশালের দোয়ারিকায় এক কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করি। গেরিলা ইউনিটগুলোকে কমান্ড করতাম। গোয়েন্দা রিপোর্ট আসতো আর্মি মুভ করছে। রেইড, কোথাও অ্যাম্বুশ, কোনো কোনো বিওপি দখল করতাম। যত অপারেশন হয়েছে সেগুলো আমি, মেজর জলিল আর ইন্ডিয়ান আর্মির চার্লি সেক্টরের অফিসাররা প্লান করতাম। ছোটদের নিয়ে একটা গ্রুপও করেছিলাম। তাদের বয়স ১১-১৪ বছরের মতো। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বরিশালের কিশোররা ছিল চল্লিশের মতো। গ্রুপটির নাম দিই 'হার্ড কর্পস অব সার্জেন্টস'। আসলে ওরা বিচ্ছুবাহিনী। ওদের এসএমজি, রাইফেল ও গ্রেনেডের ওপর ট্রেনিং দেওয়া হয়। নৌকা চালানোর ওপর ছিল বিশেষ ট্রেনিং। তাদের প্রধান কাজ ছিল অ্যামুনেশন ক্যারি ও ইন্টিলিজেন্সের কাজ করা। ওরা গল্প বলে আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কথা বলে পাকিস্তানি সেনাদের বিশস্ততা অর্জন করতো। পরে আর্মি ক্যাম্পে ঢুকে ওদের ঠ্যাং টিপে ফিরে এসে বয়ান করত ক্যাম্পের কোথায় কি আছে। তাদের কাজে ঝুঁকি ছিল অনেক। যেখানে ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধারাও যেতে চাইতো না। সেখানে ওরা বলতো স্যার আমি যাব। মেজর জলিল একবার প্লান করলেন পাকিস্তানি গানবোটকে কাউন্টার দিতে হবে। গানবোটে ৪০ মিলিমিটার বাফার থাকে। ইপিআরের স্টিল বডি লঞ্চ ছিল তখন। বিগ্রেডিয়ার সালেক ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির চার্লি সেক্টরের কমান্ডার। তাকে রিকোয়েস্ট করে আনা

হয় হেভি মেশিনগান। সেগুলো লঞ্চে ফিট করে গানবোট বানানো হয়। বঙ্গ বজ্র নামের দুটি লঞ্চকেই গানবোট হিসেবে ব্যবহার করতাম আমরা। প্রথম নেভি বলতে গেলে নয় নম্বর সেক্টরেই শুরু হয়। নেভির লেফটেন্যান্ট গাজী, লেফটেন্যান্ট আলম ছিলেন। তাদেরকে দিয়েই নৌ অপারেশনগুলো প্লান করা হতো। বরিশালের দোয়ারিকায় পাকিস্তানি সেনাদের একটা ক্যাম্প ছিল। ক্যাপ্টেন কাহারের নেতৃত্বে সেখানে ছিল বেলুচ রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি। আমাদের পুরো ব্যাটালিয়ান ঘিরে ফেলে ওদের। পাকিস্তানি আর্মি ছাড়া ওরা সারেন্ডার করবে না। পরে তারা অস্ত্র ফেলে আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। দোয়ারিকা থেকে তাদের নিয়ে আসা হয় ওয়াপদায়। পাকিস্তানি আর্মি মাথা নিচু করে ওয়াপদার দিকে মার্চ করছে। আর অস্ত্র উচিয়ে তাদের নিয়ে যাচ্ছে ছেড়া শার্ট আর ছেড়া লুঙ্গি পড়া মুক্তিযোদ্ধারা। এই দৃশ্যটা কখনও ভুলতে পারবো না। পরে তাদের ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে হ্যান্ডওভার করি। আমাদের সঙ্গে থাকতেন ফটোগ্রাফার খোকন দাস ও মিন্টু দাস। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা যুদ্ধকালীন নানা ছবি তুলতেন। মিন্টু দাস এখন বেঁচে নেই। খোকন দাস চলে গেছেন ভারতে। কিন্তু তাদের তোলা ওই ছবিগুলোই এখন মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিল। অথচ ইতিহাসে ওই ফটোগ্রাফারদের কথা তুলে ধরা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের বিজয় ঘোষিত হলে বরিশাল শহরমুখী সড়ক পথগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় নৌযানে করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীসহ তাদের দালাল ও রাজাকাররা বরিশাল ত্যাগ করতে থাকে। পাক বাহিনীর শহর ত্যাগের খবরে দীর্ঘ আট মাস অবরুদ্ধ থাকা মুক্তিকামী মানুষ বিজয়ের আনন্দে 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে দলে-দলে রাস্তায় নেমে আসে। নগরীর পানি উন্নয়ন বোর্ড ওয়াপদা কলোনীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের স্থায়ী ক্যাম্পে লুকিয়ে থাকা পাক সেনা ও তাদের দোসররা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মনজুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুলতান মাস্টার ও আমিসহ বেশ কয়েজন বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ পাক-হানাদার বাহিনীর কবল মুক্ত হয়। বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি দেশের এক-একটা এলাকায় ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছিল। দেশবাসীর মধ্যে বিজয়ের আনন্দ, প্রিয়জনের ফিরে

আসার প্রতিক্ষা, ধংসস্তুপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর স্বজন হরানো শোকের ভেতরও এক পুলকিত স্বস্তির আবহ বিরাজ করেছিলো সেই দিনটিতে। এদিন থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের মহামিলন ঘটতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে প্রিয়জন হারানোর ব্যাথা ভুলে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিনে হাজার-হাজার নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জয়বাংলা শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে শহর। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানায় মানুষ। নানাভাবে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। স্থানীয় ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে উঠানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা।

'শ্লোগাণ দিয়েই তো আমরা দেশ জয় করেছি। পাকিস্তানিরা আসছে অন্যের দেশে। জোর কইরা একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে মাতবরি করতে আসছে। আর আমাদের দেশেই আমরা। নদীনালা, খালবিল, পাহাড় সব চেনা। এখানে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও শুনেছেন ৯০ হাজার ওয়েল ইকুয়েপড সেনা সারেন্ডার করেছে। একমাত্র যদি তারা কাপুরুষ না হয়। এমন নয় যে তাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তবুও সারেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছিল কাপুরু পাকিস্তান সেনারাই। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই হয়েছে এটা। যারা ছিল আইডোলজিক্যাল যোদ্ধা। এই দেশ আমার মায়ের দেশ। মাকে মুক্ত করাই তখন ছিল সবচেয়ে বড় কাজ। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার বুকে তখন একটাই আগুন ছিল মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। পাকিস্তান আমলে ভাঙাচোরা একটা কর্নেল ছিল আমাদের। তাই নিয়েই গর্ব করতাম। এখন বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে একজন সেক্রেটারি আছে। আমার নিজের একটা পতাকা আছে। আছে একটা মানচিত্র, একটা ভাষা। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে।

১৯৭৪ সালে পরিচালক হিসেবে যোগ দেই ওয়াপদায়। ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতকরা। আগে থেকেই খন্দকার মোশতাকের ক্ষোভ ছিল আমার প্রতি তিনি বলেছিলেন 'জীবিত বা মৃত বেগকে চাই।' এরপরই আমাকে খুঁজতে ক্যাপ্টেন মাজেদ আত্মীয় স্বজনের বাসায় রেইড দিতে থাকে। এক পর্যায়ে কর্নেল তাহেরের সহযোগিতায় আমি নেত্রকোণার কাজলা

হয়ে ইন্ডিয়ায় চলে যাই। দেরাদুনে আমরা 'মুজিবস আইডোলজিক্যাল ফোর্স' নামে একটি ফোর্সও গঠন করি। সঙ্গে ছিলেন শেখ সেলিম, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সহ আরো অনেকেই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশে ফিরে আওয়ামী লীগ নেতাদের সংগঠিত করে দীর্ঘমেয়াদি কিছু করা। এ ব্যাপারে ভারতীয় সরকারেরও সহযোগিতা পাই। কিন্তু দেশে ফিরেই অনেক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ হতেই হতাশ হই। বড় বড় নেতারাই ধমকের সুরে সেসময় বলেছিল 'তুমি আবার আসলে পুলিশে ধরায়া দিমু।' এরপরই আমি সেমি কট হই। ডিজিএফআই থেকে বলা হলো সারেন্ডার করতে। সারেন্ডার করি। বহু কষ্টে চার বছর পর চাকরি ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু চার বছরের বেনিফিট পাইনি। ওই সময়টা কেটেছে নানা অবহেলা আর আতঙ্কে।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আব্দুল আহাদ চৌধুরী
মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান। রণাঙ্গনে অকুতোভয় মানসিকতা এবং সফল রণকৌশলের কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তার পরিচয় ছিল ক্যাপ্টেন আহাদ চৌধুরী। ১৯৭১ সালে তিনি তখন চট্ট গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতির দায়িত্বও পালন করছিলেন। উত্তাল মার্চের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতো তিনিও থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজারে চলে যান। ছাত্রনেতা হিসেবে এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ের খবর নিতে আসতেন তার কাছে। এর পরেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যাওয়ার। তার সঙ্গী হন আপন দুই ভাই ও ভগ্নিপতি।

তাঁর ভাষায় তিনি বলেন- যুদ্ধের দামামা তখন চারদিকে। এর মধ্যেই মেজর জেনারেল সি আর দত্ত, কমান্ডার মানিক চৌধুরী মৌলভীবাজার আসেন। তাদের সাথে দেখা করি। মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে বুঝলাম, আর বসে থাকলে হবে না। এর পরেই গণসংযোগ শুরু করি। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে উৎসাহিত করতে থাকি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ৩০-৩২ জনের একটি টিম ভারতের কৈলাশর চলে যাই। যাওয়ার পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি সবাই। আমরা কয়েকজন কৈলাশরের একটি মসজিদে উঠি। আমরা তিন ভাই আর ভগ্নিপতি

একসঙ্গেই ছিলাম। আসার সময় তেমন টাকা-পয়সা সঙ্গে আনতে পারিনি। মায়ের কিছু গহনাই ছিল সম্বল। ছাত্রলীগ করার কারণে পরিচয় ছিল ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজদের সঙ্গে। কৈলাশরে মাখন ভাইয়ের একটি ক্যাম্প ছিল। তার কাছে গিয়ে ট্রেনিং ও যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয় শেয়ার করলাম। বললাম ট্রেনিংয়ের সুযোগ থাকলে জানাতে। এর মধ্যে কৈলাশরের এসডিও অফিসারের কাছে যুদ্ধের জন্য সহায়তা চাই। সঙ্গে ছিলেন সিলেটের আক্তার ভাই, চঞ্চল ভাই। এসডিও অফিসার জানালেন, এখনো ভারতীয় সরকারের সিদ্ধান্ত আসেনি। এর কিছুদিন পরেই কমান্ডার ইন চিফ স্পেশাল ব্যাচে (সিইনসি) ডাক পড়ে। এর পর আমাকে কমান্ডার করে ১১ জনের একটি গ্রুপকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আগরতলা। পথিমধ্যে একজন পালিয়ে যায়। পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন সৈয়দ মহসিন আলী (সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী)। আমরা আগরতলায় কর্নেল রবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। সেখান থেকে কার্গো বিমানে কলকাতা। পরে আর্মি ট্রাকে করে বিহারের চাকুরিয়ায়। এর মধ্যে কলকাতার কল্যাণীতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ট্রেনিং করলাম। পরে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট জেলার সেক্টর কমান্ডারের কাছে রিপোর্ট করলাম। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রতি আক্রমণের ধরন ছিল হামলা করে আবার ভারতে ফিরে আসা। তবে আমাদের সিইনসির সদস্যদের নিয়ে তৈরি যোদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ ছিল গো-হিট অ্যান্ড স্টে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে হলে অনেক আর্মস দরকার, ফোর্স দরকার। আমাদের সব কিছু দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। কৈলাশর নদীর পাড়ে বড় একটি ক্যাম্প করে সেখানে আর্মির পক্ষ থেকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হলো ক্যাপ্টেন হামিদকে। পরে আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। গ্রামের মানুষদের বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে তাদের বাসায় থাকার ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জুড়ে বহু অপারেশন করি। তবে আলাদাভাবে কয়েকটি অপারেশনের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। মৌলভীবাজারের মুন্সিবাজার এলাকাতে পাকিস্তান আর্মিদের একটি বড় ক্যাম্প ছিল। একবার মুন্সিবাজারের পাশের একটি ছোট্ট ক্যাম্প থেকে কৈলাশরের নদীর পাড়ে ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য

জিপ গাড়ি নিয়ে বের হলে গাড়ির হেডলাইট নষ্ট হয়ে যায়। পরে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে হারিকেন দিয়ে হেডলাইটের অভাব পূরণ করি। চারদিকে ছিল মৃত্যু ভয়। এলাকাটি তখন পাকিস্তানি হানাদারদের অধিভুক্ত। যুদ্ধকালীন সময়ে মৌলভীবাজার-মুন্সিবাজার-শমসেরনগর সড়কটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। সড়কটিকে নিরাপদ রাখতে একজন মেজরের নেতৃত্বে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাকে মুন্সিবাজার এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। তখন মুক্তাঞ্চল হিসেবে বিবেচিত শমসেরনগর এলাকায় অবস্থান করতেন প্রায় ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা। ৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে আমার (আবদুল আহাদ) নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা মুন্সিবাজার এলাকায় পৌঁছে ৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ৫ ঘণ্টাব্যাপী এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আতংকিত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে ৩ পাকিস্তানি সেনা। অনেক পাকিস্তানি সেনা মৃত্যুবরণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হননি। যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয় এবং হানাদার মুক্ত হয় মুন্সিবাজর এলাকা। এ অপারেশন চালাতে আমরা যখন মুন্সিবাজারের কাছাকাছি আসি তখন সঙ্গে ছিল মায়া নামে একজন গাইড। গভীর রাত, পথে-পথে রাজাকারদের পাহারা। হঠাৎ রাজাকাররা থামতে বলল। আমাদের পলিসি ছিল আমরা কোনো শব্দ না করে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাব। কিন্তু মায়া ভুল করে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। পরে হামলা করে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকাররা। আমরা ফোর্স নিয়ে পালিয়ে রেললাইনের আড়ালে চলে আসি। তবে এ সময় আমাদের একজন সাব কমান্ডার তার অধিনস্তদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। এর আগে কয়েকবার রেকি করতে আসি মুন্সিবাজার। বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করতে হয়েছে। কাপড় কাটার কেঁচি দিয়ে দাড়ি-চুল ফেলে টুপি মাথায় পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে লুঙ্গি পরে তথ্য নিয়ে যাই মূল সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন হামিদের কাছে। অদ্ভুত বেশের কারণে হামিদ প্রথমে আমাকে চিনতেই পারেনি। এই যুদ্ধে গ্রামের মানুষ আমাদের খুব সাহায্য করেছিল। ইউনুস ও ওয়াহিদ নামে দুই যুবকের সাহস

ছিল এ যুদ্ধে বলার মতো। তবে এতো অপারেশনের মাঝেও খুব পীড়া দেয়, একটি ভুলে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগে আমার অধিভুক্ত ২২ জন মুক্তিযোদ্ধার করুণ মৃত্যুর বিষয়টি। এ বিষয়টি কোনোদিন ভুলতে পারব না। সুলেমান নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল ক্যাম্পের চিফ। হঠাৎ করে আর্থিক সংকটে পড়ে যাই বিভিন্ন ক্যাম্পের খরচ মেটাতে। এমন পরিস্থিতিতে সিলেট সেক্টর কমান্ডারের কাছে টাকা আনার জন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। তখন প্রতিমাসে ক্যাম্পে ২০ টাকা খাওয়া খরচ ছিল। আমি সুলেমানকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু সুলেমান বলল, ভাই অনেক দিন হয় বোনকে দেখি না। আমি আজ একটু বাড়িতে গিয়ে বোনটার মুখ দেখে আসি। ও ওর ছোট বোনটাকে খুব ভালবাসত। আমি তখন মহসিন আলীকে সঙ্গে করে সিলেট গেলাম। এর মধ্যে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ইউনুস নামের একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা কুড়িয়ে পাওয়া একটি গ্রেনেড দেখাতে নিয়ে গেল সুলেমানের কাছে। সুলেমান এটা নেড়েচেড়ে দেখতে ছিল। তার পাশেই ছিল বিপুল পরিমাণ মাইন ও গোলাবারুদ জমানো। হঠাৎ সেখানে আমার ছোট ভাই মে. জে. সালাম চৌধুরী আসলে ইউনুস তাকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যান খাবারে ডিম বরাদ্দের বিষয়ে কথা বলতে। এরই মধ্যে সুলেমানের হাত থেকে গ্রেনেডটি পড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গোলাবারুদ আর মাইনেরও বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তেই পুরো ক্যাম্পে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মারা যান ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় ইউনুস আর সালাম। এ স্মৃতি ভোলার নয়। এখনো গভীর রাতে সেই মুখগুলো মনে পড়লে আনমনা হয়ে যাই। ঘুম আসে না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

মোঃ মিজানুর রহমান

নারায়নগঞ্জ

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, বেতিয়ারার শহীদদের সহযোদ্ধা এবং গাজী, মুক্তিযোদ্ধা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন, শ্রেষ্ঠ অহংকার এবং গৌরবের। আমি কোন রাজনীতিবিদ লেখক কিংবা সাংবাদিক নই, নই কোন জ্ঞানী গুণীজন। জীবনের কোন পর্যায়ই খুব বেশী একটা এগোতে পারিনি। এই হতাশ জীবনের মাঝেও যখন মনে হয় আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি আমার দেশের পতাকা উড়ছে জাতিসংঘ সহ সারা বিশ্বে। আমার সোনার বাংলা গাওয়া হচ্ছে সারা দুনিয়ায়। ঘরের গৃহ বধু হচ্ছেন এমপি, মন্ত্রী আমার সোনার ছেলেরাই মেজর-কর্ণেল, এসবই স্বাধীনতার ফসল, আমার সহযোদ্ধা শহীদদের রক্তের ফসল, তখনই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। আমি নাইবা কিছু পেলাম, নাইবা কিছু হলাম, আমি তো কিছু পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করিনি। কিছু হওয়ার জন্য যুদ্ধ করিনি। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছি। অসাম্প্রদায়িক সেই সোনার বাংলা কায়েম করতে পারিনি স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের আদর্শ, আমাদের স্বপ্নটাকে ধাক্কা দিয়ে লাইন থেকে ফেলে দিয়েছে। আশা রাখি আমাদের তরুনরাই পারবে একদিন আমাদের স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করতে। ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন কিছুদিন আগে এক কলামে লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিগত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালির জীবনে শ্রেষ্ঠ অর্জন। আমিও সেই অর্জনের অংশীদার গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে। একটা জাতির

জীবনে হাজার বছরেও যে সুযোগ আসেনা, সেই সুযোগ এসেছিল আমার জীবনে ও বাঙ্গালির লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার জীবনে। আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই এবং আমিও আমাদের এলাকা গোদনাইল থেকে সহপাঠীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। এরই মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ট্রেনিং চলছিল। আমাদের সবার মধ্যে একটা উত্তেজনাভাব ছিল যেকোন মূহুর্তে একটা অঘটন ঢাকার মধ্যে ঘটে যেতে পারে। অবশেষে তাই হলো ২৫শে মার্চ ১৯৭১ইং রাত আনুমানিক ১২:১৫ মি: হঠাৎ পাক হানাদার বাহিনী ঢাকায় আমাদের বাঙ্গালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কামানের গোলার আওয়াজে ঢাকার আশপাশ কম্পিত হয়ে উঠতে লাগল তখন আমরা গোদনাইলে ২নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে, আমার আব্বার চাকুরীর সুবাদে ষ্টাফ কোয়ার্টারে থাকতাম মিলের ভিতর আনছার ক্যাম্প ছিল এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেক আনছার ছিল আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম এবং কিভাবে পাকহানাদার বাহিনীকে আটকানো যায় তার পরিকল্পনা করতে লাগলাম এবং সারা রাত জেগে কাটালাম। পরের দিন দেখতে পেলাম ঢাকা থেকে শত শত মানুষ নর-নারী শিশুসহ হেঁটে হেঁটে ডি.এন.ডি বেড়ী বাঁধের ভিতর দিয়ে আসতেছে এবং জানতে পারলাম পাকহানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে হামলা করতেছে। তারা ইষ্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্ট (তখন নাম ছিল ই.পি.আর) দেরকে নিরস্ত্র করে মারতেছে। আমাদের রাজারবাগ পুলিশ ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টরা বেরিয়ে এসে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করিতেছে। এবং জানতে পারলাম নারায়নগঞ্জ এলাকার লোক চাষাড়া রেললাইনে রেলের খালি বগি দিয়ে বেরিকেট দিয়ে তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করতেছে। এর মধ্যে জানতে পারলাম পাক সেনারা নারায়নগঞ্জ ঢোকার চেষ্টা করিতেছে এবং মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে করতে অগ্রসর হইতেছে, আমরাও কয়েকজন নারায়নগঞ্জ হেঁটে চলে যাই। কিন্তু তাদের ভারী অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের কাছে আমরা কিছুই না, প্রায় ৫.৬ ঘন্টা গোলাগুলির পর তারা নারায়নগঞ্জ ঢুকে পড়ে, আমরা এলাকায় চলে আসি।

তৃতীয় দিন পাক সেনারা আমাদের গোদনাইল এলাকায় চলে আসে এবং আমাদের বাজার মসজিদকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে যাহার নিদর্শন আজও আছে। কিন্তু আমাদের তখন কিছুই করার ছিল না। তখন থেকেই আমার যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা মিলে অনেক শ্রমিক ছিল কারো বাড়ি কুমিল্লা, কারো বাড়ি নোয়াখালী, কারো বাড়ি চট্টগ্রাম, অনেকের সাথে আলাপ করলাম কিভাবে ভারতে যাওয়া যায় এবং একজনকে পেয়ে গেলাম। তার নাম মোঃ জালাল, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি তার বাড়ি তার থেকে ভারতে যাওয়ার একটি ম্যাপ করে নিলাম। আমি ও মিলের শ্রমিক নেতা খন্দকার সাহেবের ছেলে তাহের খন্দকার, সম্পর্কে আমার মামা তোলারাম কলেজের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত এবং আর একজন মামার সহপাঠি আব্দুস সাত্তার। আমরা তিনজনে একত্রে ভোরবেলা ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। মাকে শুধু বললাম মা আমি মুক্তিযুদ্ধে যাইতেছি। মা আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। আমরা নারায়নগঞ্জ থেকে লঞ্চে চাঁদপুর চলে যাই এবং চাঁদপুর থেকে বাসে করে হাজিগঞ্জ যাই। হাজিগঞ্জ থেকে আমরা নৌকায় সোনাপুর যাব কিন্তু ওখানে পাকসেনারা সন্ধ্যার পর কারফিউ দিয়ে রাখে তাই আমরা তাড়াতাড়ি করে একটি নৌকা নিয়ে সোনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাতে খাবারের জন্য আমরা মাঝিকে দিয়ে কিছু চিড়া, গুড় কিনে নেই। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর নৌকার মাঝি আমাদেরকে বলে যে সোনাপুরও রাতে কারফিউ থাকে এবং হাজিগঞ্জ চেকপোষ্টে তারা লোক ধরে ধরে হত্যা করে। তাই আমরা রাতে সোনাপুর না নেমে নৌকার মধ্যে কাটালাম এবং ভোরবেলা সোনাপুর নামলাম। সোনাপুর থেকে হাঁটা শুরু করলাম। কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে প্রথমে আমরা রামগঞ্জ পাকিস্তান বাজার বর্তমানে বাংলাবাজার নদনা নোয়াখালির সোনাইমুড়ির কাছাকাছি পৌঁছলাম কিন্তু ওখানে আর্মির চেকপোষ্ট হওয়াতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। আমাদের নিকট ভারত যাওয়ার যে ম্যাপটি ছিল আমরা পরিকল্পনা করতে লাগলাম আমাদেরকে যদি আর্মিরা ডাক দেয় তাহলে আমরা ম্যাপটি মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলবো তারপর ঐ এলাকার একজন লোক আমাদেরকে দেখে বুঝাতে পারে যে আমরা ঐপার মানে ভারত যাব। আমরা তার সহায়তায় অন্যদিক দিয়ে সোনাইমুড়ি পার হলাম। তখন

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্র হয়ে গেছে আমরা একটি বাড়িতে উঠলাম এবং জানতে পারলাম এটা মালেক ডাক্তার সাহেবের বাড়ি। ওখানে গুড়, মুড়ি ও নারকেল আমাদেরকে রাতের খাবার দিলেন এবং বললেন ভোরবেলা আমাদেরকে বর্ডার পার হতে হবে। এই বর্ডারের নাম চোক্তাখোলা বর্ডার ওখানে পাক সেনারা গাড়ি দিয়ে পেট্রোল ডিউটি দেয় ভোরবেলা আমরা ধান ক্ষেতে বসে অপেক্ষা করতে থাকি এবং দেখতে পাই পাক সেনাদের গাড়ি ১০-১৫ মিনিট পরপর আসা যাওয়া করতেছে। এটাই তাদের পেট্রোল ডিউটি। আমরা সুযোগ মতো ঐ সময়ের মধ্যে দৌড়ে রোড পার হয়ে ভারতের ভিতরে পাহাড়ের ঐ পাড়ে চলে যাই। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প পাই। সেটি ছিল মুক্তিযোদ্ধার অন্যতম সংগঠক ও ফেনীর তৎকালীন সংসদ সদস্য শ্রদ্ধেয় খাজা আহম্মদ (প্রায়ত) সাহেবের ক্যাম্প। সেখানে আমাদেরকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। আতব চালের ভাত আর ডাল ছিল খাবারের আয়োজনে আমরা খেয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জানতে চাই। তাঁরা আমাদেরকে বেলুনিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য বলেন। এরপর আমরা ট্রাকে করে বেলুনিয়া চলে যাই। ওখানে আমরা আমাদের এলাকার ২নং ঢাকেশ্বরী মিলের জি.এম. ছিলেন মোস্তফা সাহেব ওনাকে পেয়ে যাই। আমাদেরকে দেখে খুব খুশী হন এবং আমাদেরকে টাকিয়া টিলায় একটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠান। আমরা ঐ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জানতে চাই। তারা আমাদেরকে বলেন তারা সেখানে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছেন কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থাদি হয় নাই। হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম আগরতলা থেকে একটি ট্রাক ঐ ক্যাম্পের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ নিয়ে এসেছে। যখন জানতে পারলাম ট্রাকটি আবার আগরতলা ফিরে যাবে তখন আমরা ট্রাকে উঠে পড়লাম এবং রাত আনুমানিক ১২টার দিকে আগরতলা পৌঁছালাম। সেখানে প্রথমে আমরা জয় বাংলা অফিসে যাই এবং ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে কাজ করতো এমন একজনের সাথে দেখা হয়। (স্মৃতির অতল স্রোতে আজ তাঁর নামটি স্মরণ করতে পারছি না) আমরা তাঁর কাছে আশেখ আলী মাষ্টার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করি। আশেখ আলী মাষ্টার আমাদের গোদনাইল স্কুলের শিক্ষক ও

গোদনাইল অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জানতে পারি আশেখ আলী মাষ্টার জেলখানা রোডে অবস্থিত ক্রাফট হোষ্টেলে থাকেন পরের দিন সকালে আমরা ক্রাফট হোষ্টেলে যাই এবং আশেখ আলী স্যারকে খুঁজে পাই। উনি আমাদেরকে দেখে খুব খুশী হন এবং প্রশিক্ষণের জন্য আগ্রহী শুনে, তাহের খন্দকারকে বলেন যে, তোমার আব্বা খন্দকার সাহেব তো আওয়ামীলীগ করেন আর আমরা ন্যাপ করি। তোমরা কি ন্যাপের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে? তখন আমরা ট্রেনিং নিতে সম্মত হই। ওখান থেকে আশেখ আলী স্যারের সহায়তায় পরের দিন বরদোয়ালী ক্যাম্পে গেলাম এবং তার ঠিক একদিন পর বিকেল বেলা আমাদের এলাকার মোশাররফ ভাই, সোবহান ভাই, আজিজ ভাই, শুক্কুর মাহমুদ চাচা, শহীদুল্লা সাউদ মাহা ও আওলাদ ঐ ক্যাম্পে আসেন। তাঁদেরকে দেখে আমাদের মন ভরে যায়। তারাও আমাদেরকে দেখে অনেক খুশি হন। আমরা শ্রমিক নেতা মনঞ্জুরুল আহসান খান ও বর্তমান মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রি জনাব ইয়াফেজ উসমান ভাইয়ের নেতৃত্বে তিনদিন ওখানে থাকি। তিনদিন পর ভোরবেলা আমাদের সারিবদ্ধ ভাবে দাড়া করানো হয়। আমরা প্রত্যেকে এক এক করে বাংলাদেশের পতাকা ধরে শপথ গ্রহণ করি এবং সংগ্রামী গান করতে করতে ট্রাকে করে আগরতলা বিমান বন্দরে চলে যাই সেখানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করে আমাদের আসাম তেজপুর বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমান থেকে নেমে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ট্রাকে করে আমাদেরকে মেঘালয়ের কাছে বালিপাড়া নামক স্থানে পাহার ঘেরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার কারিয়াপ্পার অধীনে আমাদের ৪০০ গেরিলা যোদ্ধার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ভারতীয় সেনা প্রশিক্ষণের জায়গা কিন্তু কোন রেগুলার আর্মির জন্য নয়। বাঁশ দিয়ে তৈরী লম্বা ধরনের অনেকগুলো ব্যারাক চারপাশে জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরী। পশ্চিম পাশে ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝর্না বার মাসই পানি থাকে। ওটাই ব্যারাকবাসীদের গোসলের জায়গা। গোসলে যেতে হলে সাবানের সাথে লবণ নিতে হয়। জোঁকের কামড় অবশ্যম্ভাবী। ব্যারাকগুলোতে সারি সারি বাঁশের তৈরী কট, উপরে ত্রিপল, (গ্রাউন্ড সিট) দিয়ে বিছানার ব্যবস্থা করতে হয় কম্বল

বিছিয়ে। পাহাড়ী এলাকা মশার উপদ্রব প্রকট। মশারী টানিয়ে ভিতরে লেখাপড়া করতে হয়। ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে ইউনিফর্ম, জংলী সু এবং হাতিয়ার পরিষ্কার করার জন্য ক্লিনিং বক্স দেওয়া হয়। আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক মগ চা ও ১টি পুরি খেয়ে পিটি প্যারেড শুরু করতাম, তারপর হাতিয়ার ট্রেনিং চলতো আমরা থ্রীনটথ্রী রাইফেল থেকে শুরু করে এস এল আর, এস.এম.জি, ষ্টেনগান, সেভেন পয়েন্ট সিক্সটু, চায়না রাইফেল এবং এল.এম.জি ট্রেনিং করি। সাথে হ্যান্ড গ্রেনেট, এক্সপ্লোসিভ মর্টার ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমরা একসাথে সবাই খাওয়া-দাওয়া করতাম। মনে হতো ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ট্রেনিং ক্যাম্প এটাই ছিল। সারাদিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বাড়ির কথা ভুলে থাকার জন্য সন্ধ্যায় গানের আসর বসতো। এখানে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর আমাদেরকে বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কেমন হয় তা বোঝার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসময় ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদেরকে ট্রাকে করে একেক দিন একেক পাহাড়ে নিয়ে যেতেন এবং যুদ্ধের মহড়া দিতেন। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে রেড.এম্বুস. ইনফেলটিসন মানে শত্রুর আস্তানায় অনুপ্রবেশ করা। বেওনেট ফাইটিং খুব কষ্টের কাজ শরীর থেকে ঘাম ঝরতো কারণ বেওনেট ফাইটিং এ চিৎকার করে শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়। আমাদেরকে মাঝে মধ্যে সারাদিন ট্রেনিং-এর পর রাতে ট্রাকে করে গ্যারিসন হলে সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতেন। এভাবে প্রায় আড়াই মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। শ্রমিক নেতা জনাব মনজুরুল আহসান খান ভাই ছিলেন আমাদের ৪০০ জন গেরিলার প্রশিক্ষণকালীন কমান্ডার এবং ইয়াফেজ ওসমান ভাই (বর্তমানে সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী) ছিলেন আমার গ্রুপ কমান্ডার জনাব মোঃ ওমর ফারুক ভাই সাবেক প্রশাসক, কুমিল্লা জেলা পরিষদ ছিলেন আর এক জন কমান্ডার, মীর মোশারফ ভাই (প্রয়াত) ছিলেন গোদনাইল শিল্প এলাকার গেরিলা কামান্ডার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর আমাদেরকে সড়ক পথে ত্রিপুরার বাইখোরা ক্যাম্পে পাঠানো হয়, এটা আমাদের বেইস ক্যাম্প এখানে অনেক হিংস্র প্রাণী ছিল। বিশেষতঃ বড় বড় হনুমান ও বড় বড় সাপ প্রায়শঃই চোখে পড়তো।

এই বাইখোরা ক্যাম্প থেকে আমরা ঢাকা নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও রায়পুরার মোট ৭৫ জনের মতো গেরিলা বাহিনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সমর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাকে করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হই। তখন চারিদিকে যুদ্ধ চলছিল। চলার পথে কামানের গোলার আওয়াজ ও মর্টার সেলের তিব্রতায় আমাদের ট্রাকগুলো মাঝে মাঝে ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠছিল আমাদের পরনে ছিল কালো হাফপ্যান্ট, কালো সুয়েটার ও লাল পিটি সু। আমাদের সাথে রাইফেল, এল.এম.জি ষ্টেনগান, গ্রেনেড, ও প্রচুর গোলাবারুদ এবং এক্সপ্লোসিভ ছিল আমরা ভৈরব টিলার কাছাকাছি এসে এক স্কুলের সামনে সবাই জড়ো হই এটা আমাদের ছিল হোল্ডিং প্লেস এখানে এসে আমার চাচাতো বড় ভাই এম.এ খালেক ও আদমজি সহিদের সাথে আমাদের দেখা হয়। তারা আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন তাঁদেরকে পেয়ে বুক আনন্দে ভরে ওঠে। তখন আনুমানিক সন্ধ্যে সাতটা, এখানে আমরা ঘন্টা খানেক থেকে তারপর ভৈরব টিলায় যাই ওখানে বিরাট একটা বটগাছ ছিল আমরা ওখানে মিটিং করি। আমাদের নির্দেশ ছিল আমরা যদি যুদ্ধ করতে যেয়ে কোন কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই তাহলে এই টিলার উপর বটগাছের নিচে এসে আবার অবস্থান নিব। এখানে আমাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হলো যেমন- ১। ফায়ার গ্রুপ ২। মেইন ফায়ার গ্রুপ ৩। ক্যারি গ্রুপ ৪। ডেমোনেশন গ্রুপ ৫। এ্যাসল্ট গ্রুপ এবং ৬। সাপোর্ট গ্রুপ।

একজনকে ফার্ষ্ট এইড বক্স দেওয়া হলো আমি জনাব ইয়াফেজ ভাইয়ের গ্রুপে থাকাতে আমাকে রাইট সাপোর্টে একটি এল.এম.জি দেওয়া হলো এবং আমার সাথে নবাবগঞ্জের মতি নামে একজন এবং রায়পুরার কুদ্দুস নামে আর একজনকে রাখা হলো। তাঁদের দুইজনকে দুইটা রাইফেল দেওয়া হলো কারণ এল. এম.জি অটোমেটিক হাতিয়ার মাঝে মাঝে ফায়ার করতে করতে স্থবির হয়ে যায়। তাই সাথে রাইফেল ম্যান থাকে লেফট সাপোর্টে আর একটি এল.এম.জি দেওয়া হলো যারা ক্যারী গ্রুপে ছিলেন তাদের হাতে রাইফেল অতিরিক্ত গোলা বারুদ ও আমাদের জিনিস পত্র দেওয়া হলো। আমাদেরকে গাইড এসে বললো রোড ক্লিয়ার আছে তখন আনুমানিক ১০ টা কিন্তু আমরা ঐ টিলার থেকে

দেখতে পেলাম দূরে রোডের উপর একটি বাতি কিছুক্ষন থেকে আবার চলে গেল। ইয়াফেজ ভাইয়ের নির্দেশে দুইজন স্থানীয় গাইড আমাদেরকে রোডের ডানদিকে এল.এম.জি নিয়ে বসিয়ে দেয়। পরিকল্পনা ছিল ডান দিক থেকে যদি শত্রু আসে তাহলে আমরা ডানদিকে থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ করবো, বাম দিকের গ্রুপ ঐ একই উদ্দেশ্যে মোতায়েন করা হয় বাকীরা আমাদের দুই গ্রুপের মাঝখান দিয়ে রোড ক্রস করবে, অধির আগ্রহে আমরা যারা সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য তারা শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, বাকীরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হওয়ার জন্য সোজা লাইন ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ইতিমধ্যে পাক সেনারা তাদের সহযোগী স্থানীয় রাজাকার আল-বদরদের মারফত আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিপরীত পার্শ্বে এম্বুস পেতে বসে ছিল। কিন্তু ওরাও জানতো না আমরা সাপোর্ট গ্রুপ রাস্তার এই পার্শ্বে অবস্থান নিয়েছি। যখনই আমাদের মধ্যবর্তী দলটি ভৈরব টিলা থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ক্রস করার জন্য উপড়ে উঠলো ঠিক তখন পাকবাহিনীর দলটি "হোল্ড" বলে চিৎকার করে উঠলো সাথে সাথেই অগ্রগামী দলটির নেতৃত্বে থাকা নিজাম উদ্দিন আজাদ ভাই সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে তাঁর হাতে থাকা স্টেন গানের ট্রিগার চাপলেন কিছুক্ষন ষ্টেনগানের গুলির শব্দ শোনা গেল তারপর হঠাৎ ষ্টেন গানের শব্দ থেমে গেল গুলির শব্দ পেয়ে আমরা সাপোর্ট গ্রুপও দুইদিক থেকে এল.এম.জি দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করতে লাগলাম আমরা যখন দুইদিক থেকে ফায়ার শুরু করলাম তখন গোটা এলাকা গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো আমরা দুই দিক থেকে আক্রমণ করতে লাগলাম পাকসেনারা বুঝতে পারেনি যে এভাবে ওরা বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। হতচকিত শত্রু এক পর্যায়ে ফায়ার বন্ধ করে দিল, কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেলাম ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুই দিক থেকে সারিবদ্ধভাবে পাকসেনাদের গাড়ি সার্চ লাইট জালিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। তখন এমন অবস্থা যে শত্রু আমাদের প্রায় নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে গেছে। বৃষ্টির মত আমাদের চারিদিকে গুলি আসছে। আমরা বাধ্য হয়ে গুলিবর্ষণ করা বন্ধ করে দেই।

পাকসেনারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গুলি করতে করতে "ইয়া আলী" বলে ধান ক্ষেতে চলে আসে এবং চিৎকার করে বলে সালা মুক্তি "এল.এম.জি ওয়ালা কো পাকড়ো" আমাদের মধ্যে যারা গুলি খেয়েছে তারা গুলির যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল পাকহানাদার বাহিনী টর্চ লাইট মেরে একজন একজন করে বেয়নেট চার্জ করতে থাকে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের উপর নির্দেশ ছিল যে সি.এন্ড.বি মহাসড়ক পারাপার হতে গিয়ে পাকসেনাদের সাথে যদি যুদ্ধে জড়িয়ে যাই বা বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে আমাদের মিটিং প্লেসে মানে ভৈরব টিলার কাছে আবার সবাই একত্রিত হব। তাই আমি ক্রলিং করতে করতে পিছনে হটতে লাগলাম। মনে হলো হয়তো আমাদের দলের কেউই আর বেঁচে নেই, রাতের অন্ধকারে অপরিচিত জায়গায় যেখানে উপর্যপুরী বৃষ্টির মত গুলি আসছে মর্টার এবং কামানের গোলার আওয়াজে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন এটাই কেয়ামত মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম এবং অনেক পিছনে সরে এসে এক জায়গায় পজিশন নিয়ে রইলাম। পরে আমাদের দলের আরো কয়েকজনকে পেলাম তাঁদেরকে নিয়ে ভৈরব টিলায় গেলাম আসার সময় আমার দুই পা জোঁকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। রক্ত দেখে অনেকে মনে করেছিলেন আমিও গুলি খেয়েছি হাবিব নামে ঢাকা নবাবগঞ্জ থানার আমার এক সহযোদ্ধা তাঁর ঘাড়ের মধ্যে ষ্টেনগানের গুলি নিয়েই দৌড়ে ফিরে আসেন এবং যন্ত্রানায় ছটফট করতে লাগলেন তাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় আগরতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের মধ্যে তখন অনেকেই ফেরত আসে নাই। অন্ধকার এবং অপরিচিত জায়গা এ কারণে তাঁরা নানাদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর শুক্কুর মাহমুদ চাচার মুখে শহীদুল্লাহ সাউদের করুন মৃত্যুর কথা জেনে সোবাহান চাচাসহ আমরা অনেকে কেঁদে উঠলাম। সোবাহান চাচা বললেন আমি বাড়ি গিয়ে কি জবাব দিব পরে জানতে পারলাম দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আহত অবস্থায় শত্রু বাহিনী আজাদ ভাইকে এবং শহীদ মোঃ বশিরুল ইসলামকে (বশির মাষ্টার) গ্রেফতার করে এরপর বহু অনুসন্ধানের পরও তাঁদের আর খুঁজে পাওনা যায়নি। এসময় বেতিয়ারায় শহীদ

হন শহীদ সিরাজুল মনির জাহাঙ্গীর, শহীদ জহিরুল হক, দুদুমিয়া, শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ, শহীদ আব্দুল কাউয়ুম, শহীদ আওলাদ হোসেন, শহীদ আব্দুল কাদের, শহীদ মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, তাঁদের মধ্যে শহীদ আওলাদ হোসেনও শহীদ শহীদুল্লাহ সাউদ আমাদের গোদনাইল সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার।

এভাবে সারারাত কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলা আমরা অনেকেই ভৈরব টিলা পর্যন্ত গেলাম আমাদের সহযোদ্ধাদের লাশ আনার জন্য ওখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী দূরবীন দিয়ে পাকসেনাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তারা জানালেন পাকসেনারা শহীদদের দেহবাশেষ গুলো পাহাড়া দিচ্ছে কারণ ওরা জানতো লাশ আনার জন্য আমরা ওখানে আবার যেতে পারি। ভারতীয় সেনারা আমাদেরকে লাশ আনতে যেতে নিষেধ করলেন, বললেন তোমরা পাকসেনাদের এম্বুশ (ফাঁদ) থেকে বেঁচে এসেছ ইউ আর লাকী, এম্বুশে (ফাঁদে) পড়লে কেউ বেঁচে আসতে পারে না। পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুই দিন পর্যন্ত পাকসেনাদের স্থাপনা ও ঘাটির উপর গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে পাক সেনারাও ওদিক থেকে কামান ও মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে, আমরা দুইদিন বাঙ্কারের ভিতর ছিলাম। অবশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের স্থাপনা ও ঘাটি গুলো গুড়িয়ে দেয়, আমরা আবার বেতিয়ারা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং দেখতে পাই স্থানীয় বাসিন্দারা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে শহীদদের দেহাবশেষগুলো সমাধিস্থ করছেন।

আমরা গুণবতি হয়ে কাজিরহাট কাজির বাজার এলাকায় অবস্থান নেই। আমাদের এতগুলো মুক্তিযোদ্ধাকে ভাগ করে গ্রামের লোকজন ৫ জন ১০ জন করে যার যেমন সামর্থ আছে খাওয়াতো। রাতের বেলা আমরা অপারেশনে বের হতাম, আমরা জানতে পারি নোয়াখালীর "বজরা" নামক স্থানে পাকসেনাদের সাথে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলছে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপনে যুদ্ধ করছে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষের দিকে, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা বজরা চলে যাই এবং জানতে পারি বজরা মসজিদের ভিতর পাকসেনারা অবস্থান নিয়েছে। আমরা একটি বাড়িতে একত্রিত হই এবং কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে ঐ বাড়িতে রেখে দুইটি গ্রুপ দুই দিক থেকে এল.এম.জি

এবং রাইফেল দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে করতে পাকসেনাদের ঘাঁটি বজরা মসজিদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি এবং মাঝে মধ্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করি প্রায় তিন-চার ঘন্টা যুদ্ধ করার পর আস্তে আস্তে পাকসেনাদের গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। তারা হতোদ্যম হয়ে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করতে থাকে এবং পাকসেনা রাজাকার ও মিলিশিয়াসহ প্রায় ৬৪ জনের মত আমাদের নিকট আত্মসমর্পন করে। আমরা বজরা এলাকা মুক্ত ঘোষণা করি, স্থানীয় বাসিন্দা ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সহাসিকতার খুব-প্রশংসা করেন।

এরপর আমরা সংবাদ পাই যে পানি এলা নামক একটি স্থানে পাকসেনারা অবস্থান করছে, এবং তারা পানি এলা বাজার পুড়িয়ে দিয়েছে এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা নোয়াখালির সোনাইমুড়ি থেকে নদনা সেখান থেকে রামগঞ্জ, দশঘরিয়া হয়ে পানি এলায় পৌঁছাই এবং একটি স্কুলে অবস্থান নেই। আমরা স্থানীয়দের সহায়তায় কোদালও বেলচা দিয়ে ব্যাংকার বানিয়ে পজিশন নিয়ে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ শুরু করি, এবং অগ্রসর হতে থাকি আমাদের আক্রমণের মূখে পাক সেনারা হাজিগঞ্জের দিকে পিছু হটতে থাকে আমরা তাদেরকে আত্মসমর্পন করানোর জন্য আহবান জানাই কিন্তু তারা আমদের কাছে আত্মসমর্পন না করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসর্ম্পন করে।

পরে আমরা হাজিগঞ্জ থেকে ইয়াফেজ ভাইয়ের নেতৃত্বে ঢাকা মুন্সিগঞ্জের গ্রুপটি চাঁদপুর চলে আসি এবং গোদনাইল (সিদ্ধিরগঞ্জ থানা) মীর মোশাররফ ভাইয়ের গ্রুপটি ও রায়পুরের গ্রুপটি মঞ্জুরুল আহসান ভাইয়ের নেতৃত্বে রায়পুরার দিকে চলে যায়। চাদপুর এসে আমরা একটি নৌকা নেই এবং মুন্সিগঞ্জ হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। তখন ডিসেম্বর মাসের প্রথম, আমরা মেঘনা নদীতে অনেক লাশ ভাসতে দেখি। আমরা মেঘনা নদী পার হয়ে মুন্সিগঞ্জের চর এলাকার কুল ঘেঁসে যেতে থাকি। হঠাৎ দেখতে পাই পাকসেনাদের একটি গানবোট নদীর মাঝখান দিয়ে আসতেছে। সাথে সাথে আমাদের দলনেতা ইয়াফেজ ভাই আমাদেরকে সতর্ক করেন এবং বলেন তোমরা সবাই নৌকার মধ্যে শুয়ে পর কারণ ওরা যদি আমাদের উপর গানবোট থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের মৃত্যু অবসম্ভাবী, আমরা সবাই আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে

গানবোটটি আমাদের নৌকার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম তাদের যুদ্ধ করার মনোবল আর নেই। আমরা মুন্সিগঞ্জে আমাদের সহযোদ্ধা মো. মহসিন এবং আব্দুল আজিজকে রেখে তালতলা চলে যাই এবং সেখানে রাত হয়ে যায়। আমারা তালতলা স্কুলে রাত যাপন করি। পরের দিন সকাল বেলা আমারা শ্রীনগর হয়ে নবাবগঞ্জ চলে যাই এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘটক আজিজুর রহমান ফকু ভাইয়ের বাড়িতে রাত্র যাপন করি। পরের দিন সকালবেলা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আমারা ঢাকার কেরানীগঞ্জ এসে দেখতে পাই ভারতীয় একটি যুদ্ধ বিমান যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে পাইলট প্যারাসুট দিয়ে নিচে অবতারণ করে এবং বিমানটি নিচে পড়ে যায়। আমারা ১৫ডিসেম্বর বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে নারিন্দা সদর আব্দুল হালিম সাহেবের বাড়িতে অবস্থান নেই। পরদিন দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর পেলে আমারা ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমারা বিজয় উল্লাসে উপরের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করি। পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকাতে ১০জন করে গ্রুপ করে গ্রুপ করে ২৮ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমি বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় আমার মা-বাবা এবং বাড়ির সবাই ভেবেছিল আমি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছি। এদিকে আমিও বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির ও উদগ্রীব হওয়াতে মঞ্জুরুল আহসান খান ভাই তখন একটি গ্রুপ নিয়ে ঢাকার পোস্তগোলা উজালা মেচ ফেক্টরিতে অবস্থান করতে ছিলেন, তিনি আমার অবস্থান জানতে পেয়ে তোপখানা রোড ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে চলে আসেন। যেখানে (প্রায়ত) কমরেড সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ভাই অফিস করতেন। মঞ্জু ভাই আমাকে উনার (লাল 50) মটর সাইকেল করে অস্ত্রসহ আমার বাড়ি গোদানাইলে নিয়ে আসেন। আমার মা, বাবা, ভাই, বোন এবং বাড়ির সকল লোকজন খবর শুনে রাস্তার উপর চলে আসেন এবং আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান সকলে। আমিও দূর থেকে মা বাবাকে দেখে আমার কান্না চলে আসে, মা বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দেন, আজ আমার বাবা-মা নেই, কিন্তু সে দৃশ্য আজও আমার কাছে স্মৃতি হয়ে আছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আফজাল হোসেন

বরিশাল

১৯৬৯ সালে আমি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলাম, তখন আমি ছাত্র-আন্দোলন, গণআন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেয়। ১৮ ই মার্চ হল ছাড়তে বাধ্য হলাম। তখন আমার চাচাতো বোন ছিল ময়মনসিংহে, তার স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করতেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তার দুটি বাচ্চা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিল বরিশাল। আমার বাড়ি ছিল বরিশাল শহরে, আমার মা বাবা বরিশালেই থাকতেন। দাদার বাড়ি ছিল ভান্ডারিয়া, আমি ঢাকা থেকে চলে আসি ভান্ডারিয়ায়। আমি আটকা পরে গেলাম দাদার বাড়িতে। ওখানে এক মাস ছিলাম। ওখান থেকে আমি চিন্তা করতে ছিলাম, কিভাবে আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো। আমি থানার সাথে যোগাযোগ করলাম। সেখানে ট্রেনিং নেওয়া যায় কিনা, কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে পারিনি। ভান্ডারিয়া থেকে এক মাস পরে, পায়ে হেঁটে আমি বরিশাল শহরে আসি। সকাল পাঁচটার সময় রওয়ানা দিয়েছি, বিকাল পাঁচটার সময় বরিশাল পৌঁছেছি। একজন আত্মীয় ছিলেন সাথে। বরিশাল এসে দেখি, তখনও বরিশালে আর্মি আসেনি। এপ্রিলের শেষের দিকে আর্মি আসছে। বরিশালে উড়োজাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজ থেকে এ্যাটাক

করছে পাক আর্মিরা এবং বোম্বিং করছে। বরিশালের লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে। শেষে আমাকে বরিশালের কাশীপুর থেকে পাশ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার তিন দিন পর চলে আসছি নিজের বাড়িতে। আমার বন্ধু বান্ধবের ভিতরে অনেকে মারা গিয়েছে আর্মির হাতে। আমার বন্ধু সালাম ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, থাকতো মুহসিন হলে। দুজনে ভাবলাম যে এদেশে থাকা নিরাপদ নয়। আমার বন্ধু সালাম পরবর্তীতে শিক্ষকতা শুরু করেছিল, প্রফেসর সালাম নামে পরিচিত হয়। আমি আর আমার বন্ধু পরিকল্পনা করলাম, কিভাবে বরিশাল থেকে বর্ডার ক্রস করে হাসনাবাদ আর্মি হেড কোয়ার্টারে যাবো। আমরা যোগাযোগ করলাম, জুন মাসের শেষের দিকে বাসা থেকে অল্প কিছু টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলাম। সদর রোড ওর বাড়ি, দু'জনে একসাথে রিকশা যোগে বরিশালের নাজিরেরপুলে আসলাম। ওখান থেকে ছোট্ট একটা লঞ্চে চলে গেলাম চাখার। আমার এক পরিচিত বন্ধু এবং বড় ভাই ছিল সে বিএম কলেজে পড়তো, নাম হলো কচি। বাড়ি ছিল এ.কে. ফজলুল হকের বাড়ির একদম পাশে। আমরা কচির সাহায্য নিলাম। ২ দিন সেখানে ছিলাম, শেষে দেখি ওর বাবা ভীষণ ভাবে পাকিস্তানের সাপোর্ট করে। রাতে আমরা চিন্তা করলাম হয়তো আমাদের ধরিয়ে দিবে। উনি বুঝতে পারছেন আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি। পরের দিন সকালে আমরা ওদের কিছু না বলে, পালিয়ে চলে গেলাম গ্রামের বাড়ি, নবগ্রামের বাড়িতে। ঐখানে এ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন সাহেব যিনি ছিলেন বরিশালের এমএনএ, তার শালা আমার বন্ধু ছিল। ঐ বন্ধুর বাড়িতে ৮/১০ দিন থাকি। ঐখানে থেকে পরিকল্পনা করলাম, কিভাবে হিন্দু শরণার্থীদের সাথে ইন্ডিয়া যেতে পারি। ওখান থেকে শরণার্থীদের সাথে নৌকায় ফরিদপুর, সাতলা বান্ধা পাড় হয়ে চলে গেলাম খুলনা, খুলনা রুপসা পার হতে গিয়ে দেখা হলো বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের সাহেবের সাথে, নাসের সাহেবের সাথে পরিচয় হলো, নদী পার হয়ে চলে গেলাম যশোরে। যশোর থেকে আমরা চলতে থাকলাম, বর্ডারে গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক যাচ্ছে, রাজাকারেরা পথে চেক করে কোনো মুসলমান যাচ্ছে কি-না। এ কথা শোনার পর ভাবলাম আমাদের হিন্দু পরিচয় দিতে হবে। আমার আর বন্ধুর নাম, বাবার নাম পরিবর্তন করে

রাখলাম। তখন আমরা লুঙ্গি পরা ছিলাম, হাতে একটা পোটলা ছিল, গলায় ছিলো গামছা। গামছার একপাশে চিড়া আর আরেক পাশে ছিলো গুড় বাঁধা। ঐগুলো খেয়ে আমাদের ২/৩দিন কেটেছে, তারপর যেদিন বর্ডার ক্রস করবো, তার আগের দিন রাতে, আমরা এক বুড়ি মায়ের ঝুপড়ি ঘরে হাজির হলাম। বুড়ী মা ঝুপড়ি ঘরে একা থাকেন। পাশে দুটি ছাগল থাকে। বললাম বুড়ী মা রাতে থাকার একটু জায়গা দেওয়া যায়। সে বললো কোথায় থাকবে, আমার তো একটাই ঘর, এখানে তো আমি থাকি। তোমরা ছাগলের ঘরে ঘুমাতে পারো, আমাকে ২ টাকা দিলেই হবে। আমি আর বন্ধু এতোটাই ক্লান্ত ছিলাম, ঐ ছাগলের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লাম। বুড়ী মাকে বললাম ভোর পাঁচ টার সময় জাগিয়ে তুলতে। বুড়ী মা পাঁচ টার সময় জাগিয়ে দিলেন। আমরা সকালে হাটা শুরু করলাম, বর্ডার ক্রস করার সময় যশোরে একটা রেল লাইন ছিল, সেখানে আর্মি পাহারায় ছিল, ভোর পাঁচ টায় নামাজের জন্য এক ঘন্টা বর্ডারের পাহারা বন্ধ ছিল। এই সুযোগে আমরা বর্ডার ক্রস করি, সন্ধ্যার সময় বসিরহাটে গিয়ে হাজির হলাম। সেখান থেকে বাসে করে চলে গেলাম কলকাতা, কলকাতায় আমার এক বন্ধু ছিল সংকর, বরিশালের সিনেমা হলের মালিকের ছেলে। ওর ওখানে গেলাম, ওখানে ৪/৫ দিন থাকলাম। থাকার পর আমরা চলে গেলাম হাসনাবাদ আর্মি হেড কোয়ার্টারে। সেখানে গিয়ে দেখি বরিশালের অনেক বন্ধু বান্ধব, পরিচিত লোকজন। মেজর জলিল সাহেবের সাথে দেখা হলো, ওখানে আমরা শরণার্থী হিসাবে ছিলাম। ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম চাকুলিয়াতে। ওখানে আমরা ১ মাসের ট্রেনিং নিলাম, আমার সাথে তোফাজ্জল ভাই, কুতুব, পরিমল, তারেক, ড. সালাম আরো অনেকেই ছিল। একমাস হার্ড ট্রেনিং এ বিভিন্ন রকম অস্ত্র চালনা শিখলাম এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং পেলাম, ট্রেনিং এর শেষের দিন আমাদেরকে জয়বাংলা প্যারেডের পরে একটা ডামি যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তখন আমাদেরকে এক রাত জঙ্গলে থাকতে হয়েছে, আমি জঙ্গলের ভিতর শুয়ে আছি এমন সময় একটা কেউটে সাপ আমার থেকে দেড় ফিট উপর দিয়ে এদিক থেকে ওদিকের গাছের ডালে যাচ্ছিল, তখন আমি সাপের দিকে তাকিয়ে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেলাম, সেদিন যদি সাপটা আমাকে কামড় দিত তাহলে ঐ

দিনই আমার মৃত্যু হতো। এমন অনেক ঘটনা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না। ট্রেনিং শেষে আমরা হাসনাবাদে ফিরে এলাম। তখন পরিচিত হলাম ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ (সাব-সেক্টর কমান্ডার ৯ নং সেক্টর) ভাইয়ের সাথে। মেজর জলিল সাহেব আমাকে দেখে বললেন তুমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র শারীরিক অবস্থা খুব ভালো তুমি থার্ড ব্যাচে আর্মি অফিসার ট্রেনিং নিবার জন্য যাবে। আমি বললাম স্যার আমি এক মাসের ট্রেনিং নিয়েছি, এখন আমি দেশে যুদ্ধে যেতে চাই, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি। তখন আমাকে বেগ সাহেবের সাথে দেয়া হলো হিঙ্গলগঞ্জ ক্যাম্পে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ একজন প্রচুর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, আমি তার সাথেই বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম। ওখান থেকে আমি অনেক ছোট খাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি সুন্দরবনের ভিতরে ও বাহিরে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে পার্টিকুলারি আমকে একটা এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো কাঠখালী ও কুড়িখালীর ওখানে আমাদের বিওপি ছিল, একটা নদীর পাড় ঘেষে একটা ক্যাম্প ছিল। সেখানে আর্মিগুলো থাকত, আমাকে বলা হয়েছিল ওই ক্যাম্পটাকে (বিল্ডিং) উড়িয়ে দেবার জন্য। রাতের অন্ধকারে আমার কিছু সাথী (তারেক, পরিমল, সালাম) সহ আরও কয়েকজনকে নিয়ে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সম্পূর্ণ বিল্ডিংটাকে আমরা উড়িয়ে দিলাম (আগস্ট মাসের শেষের ঘটনা)। এবং এটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তার পর আরও ছোট খাট যুদ্ধ হয়েছিল। মূলত আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল হিট এন্ড রান, কেননা আমাদের সেই ধরনের সামর্থ বা অস্ত্র ও পরিকল্পনা ছিল না যে তাদের সামনা সামনি যুদ্ধ করবো। ওদেরকে মাত্র ভয় দেখানো এবং আমাদের শক্তির জানান দেওয়া ছিল আসল উদ্দেশ্য। তারপর সেখান মুক্ত হল এবং ৩ দিন বা এক সপ্তাহ পরে মুন্সিগঞ্জের দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। মুন্সিগঞ্জে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল (রাজারবাগ ট্রেনিং ক্যাম্প) সেখানে আর্মি ছিল ও ক্যাপ্টেন মহি ছিল। পরবর্তীতে ওখানে আমাকে একটা দায়িত্ব দিল রকেট লাঞ্চার ফায়ার করার, আমরা আর্মি ক্যাম্পের তিন দিকে ঘেরাও করি, খুব ভোর বেলা, প্রায় ৫ অথবা ৬ টার দিকে। সূর্য ওঠার আগে আমাকে ফাস্ট ফায়ারিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল এবং রকেট লাঞ্চার ফায়ার

করার। তো আমার সাথে একজন সহযোগী ছিল যে রকেট লাঞ্চার লোড করবে তার নাম আমার খেয়াল নেই। সেখানে আমকে সময় দেওয়া হলো এবং আমি ক্যাম্পের মাঝে রকেট লাঞ্চার ফায়ার করলাম। আর রকেট লাঞ্চার ফায়ার করা একদম ইজি। আর এটা আমার একটা বিরাট স্মৃতি হয়ে গেল। তারপর চার দিক থেকে ফায়ারিং করল, সেখানে অনেক লোকজন মারা গেছে এবং আমরা এই সুযোগে অনেক অস্ত্র লুটপাট করেছি। এটা একটা বিশেষ ঘটনা। তারপর মুন্সিগঞ্জে অনেক দিন ছিলাম সেখানে অনেক ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে, এছাড়া সুন্দরবনের ভিতরে আমি অনেক অপারেশন করছি। সুন্দরবনে আমাদের একজন গাইড ছিল তার নাম হলো নাওয়াজ আলী ফকির, সে আমদের গাইড করে নিয়ে যেত। আমরা সেখানে অনেক ভয়ে ছিলাম, যেমন- বাঘের ভয় ও অন্যান্য প্রাণীর ভয়। আমরা অনেক কষ্ট করে সেখানে থেকেছি এবং ছোট খাট যুদ্ধ করেছি। যাহোক পরবর্তীতে নভেম্বরের দিকে আমরা আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলাম এবং এক পর্যায়ে আমরা শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) গেলাম। শ্যামনগর গভর্নরের ওখানে দো'তলা বাড়িতে একটা ক্যাম্প ছিল যেখানে রাজাকরদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। ওই ট্রেনিং ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। বেশ আমরা পরবর্তীতে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাড়িটি উড়িয়ে দিলাম। বাড়িটি উড়াতে গিয়ে আমার সাথে অনেকেই ছিল যাদের নাম আমি আগেও বলেছি এবং এছাড়া আরো অনেকে ছিল যাদের নাম খেয়াল নেই। আমি প্রথম বারে পুরো বাড়িটি উড়িয়ে দিতে পারি নাই, কেননা সেখানে এক্সপ্লোসিভ কম হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন কর্ণারে এক্সপ্লোসিভ লাগানো হয়নি। আর আমাকে যেভাবে বলা হয়েছিল আমি ঠিক সেইভাবে করতে পারি নি। পরে আমি ওয়াকিটকির মাধ্যমে জানালাম যে আমি পুরো বাড়িটি ধ্বংস করতে পারি নি। তখন আমার কমান্ডার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন যে আমি যেভাবেই হোক বাড়িটিকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখতে চাই। পরবর্তীতে উনি নিজে আরও কিছু এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আসল এবং সেগুলো লাগিয়ে পুরো বাড়িটা ধ্বংস করে দেই। সেখানে আমি ও আমার সাথে অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল (কুতুব, ফিরোজ, লিয়াকত....)। পরবর্তীতে আমার বন্ধুদের নিয়ে বরিশালের দিকে

রওনা করি এবং বরিশাল যেতে যেতে আরও অনেক ছোট ছোট যুদ্ধ করি। তারপর আমরা ১৮ডিসেম্বর (স্বাধীনতার দুই দিন পর) বরিশালে গিয়ে পৌছালাম। আমরা নানাভাবে স্বাধীনতার উল্লাস প্রকাশ করলাম। সেখানে অনেক মুক্তযোদ্ধার সাথে পরিচয় হয়েছে। এবং সেখানে মেজর জিয়া সাহেবের সাথেও আমাদের দেখা হইছে। যাহোক সে অনেক ঘটনা। তারপর আমরা বরিশালে এসে প্রথমে উঠলাম হাকিম আলী স্কুলের মাঠে। সেখানে প্রায় ১৫০ জনের মতো মুক্তযোদ্ধা ছিল। পরবর্তীতে ওয়াপদা কলোনীর ওখানে কিছু পাক আর্মি ছিল তাদেরকে আমরা ১৯ তারিখে স্যারেন্ডার করতে বলি। কিন্তু তারা স্যারেন্ডার করতে চায়নি। তারপর আমরা মাইকে এনাউন্স করলাম, যে আমরা তোমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছি। তোমরা স্যারেন্ডার করো, তা না হলে তোমদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তো পরবর্তীতে তারা স্যারেন্ডার করলো এবং আমরা ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকি এবং ক্যাম্পের ভিতরের সব অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের কব্জায় নিয়ে আসি। পরবর্তীতে আমি শিকারপুর এলাকায় বেগ সাহেবের নেতৃত্বে আরও কিছু রাজাকারদের স্যারেন্ডার করিয়েছি। তারপর আমি বরিশালে অবস্থান করলাম এবং বরিশাল সার্কিট হাউজে শিফ্ট হলাম। সেখানে আমাদের ক্যাম্প ছিল। কিছু দিন পর বেগ সাহেব ও আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা ঢাকায় চলে গেলেন এবং আমি ওখানে মাস খানেক অবস্থান করলাম। সেখানে উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করতাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বিচার আচার করতাম। আমাদের কাছে অনেক বিচার আসত আর আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে এগুলো করতাম। আরও একটি মজার ঘটনা আছে, সেটা হলো আমি অনেক সিগারেট খেতাম। আর আমি যখন ভারতের আর্মিতে ছিলাম তখন আমাকে ৭৫ টাকা করে বেতন দিত আর আমি সেই সময় চারমিনা সিগারেট খাইতাম। আমরা পরবর্তী সময়ে যখন বাংলাদেশে আসলাম তখন আমাদের বরিশালে রাজনৈতিক নেতা ছিল নুরুল ইসলাম মঞ্জু। সে আমাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে সার্কিট হাউজের বেতনের জন্য। তো সে টাকা আমি সার্কিট হাউজের খাটের নিচে রেখে দিছি। অথচ আমি সিগারেট খাই কিন্তু আমার সিগারেট খাওয়ার পয়সা নাই। এটি একটি বিরল ঘটনা। আমার কখনও মনে হয় নাই যে বস্তার

ভেতর থেকে টাকা নিয়ে সিগারেট খাই। সেই বাংলাদেশই এই বাংলাদেশ, এটাই আমাদের দুঃখ। এখন শুনি ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি হয়ে যায়, কেউ আবার আত্মসাৎ করছে। আর মানুষ জন কি করতেছে না করতেছে। এই হলো বাংলাদেশের অবস্থা। আমরা কি দেশ চাইলাম আর কি দেশ হইল। আমরা তো এই বাংলাদেশ দেখতে চাই নাই, আমরা দেখতে চেয়েছিলাম আরও উন্নত সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ। আমাদের দেশ স্বাধীন করছি, দেশের মানুষের জন্য, কিন্তু এখনও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশ পুরোপুরি স্বাধীন হয় নাই। সুতরাং আশা করি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এইগুলো দেখবে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান দিবে। মুক্তিযোদ্ধাদের যতদিন এই দেশ সম্মান দিতে না পারবে, এই দেশ সামনে এগোনো খুব কঠিন। এখন দেখছি আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব হারিয়ে গেছে। বাকিরাও হয়তো কিছু দিনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব। কিন্তু আমরা চাই এই দেশের মানুষ সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হোক। কোন রকম হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। মানুষ মানুষের জন্য থাকবে। আশা করি এই দেশ রাজাকারদের হাতে থাকবে না ও স্বাধীনতা বিপক্ষের শক্তির হাতে যাবে না। এই আমার শুভ কামনা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
আব্দুল মজিদ চৌধুরী
মৌলভীবাজার

আমার জন্ম ০২/০৫/১৯৫১ইং সালে রাজনগরের টগরপুর গ্রামে। আামার বাবার নাম মৃত আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী। তিনি ২০১৫ সালে মারা যান। আমার বাবা তার জীবনের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে উনি চা বাগানের চাকরি করতেন। এক পর্যায়ে তিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। সিলিট এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন চা বাগানে উনি চাকরী করেন। শেষের দিকে উনি একটি চা বাগানের মালিক ও হতে পেরেছিলেন। সেটা ইরগাজিয়া, কুলাউরাতে। আমার মা মৃত ওয়াহিদুন্নেছা চৌধুরী। উনি আমার আব্বার সংসারে আসার পর উনি আমাদের বাড়ির সামনে যে স্কুল ছিল সে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। জীবনের প্রথম থেকেই আমাদের শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বা চেষ্টা ছিল। বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। উনি চট্টগ্রামেও চাকরী করতেন যার কারণে এক জায়গায় লেখাপড়া করা হয়নি। তবে আমার এলাকা রাজনগর হাই স্কুলে এক বছর লেখাপড়া করার সময় পাই। ১৯৭১ সালে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা আসে তখন আমি চট্টগ্রাম কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। আমি হোস্টেলেই থাকতাম। আমার সাথে আমার ছোট ভাই সেও ছিল। তার নাম মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম চৌধুরী (অবঃ)। আমরা ০২ (দুই) ভাই চট্টগ্রাম কলেজে এক সাথে লেখাপড়া করি। লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিভিন্ন কাজে আমরা সক্রিয়া ভূমিকা রাখি ও আমরা ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। অনেক পূর্বের ঘটনা হলেও আমি আজকে স্মরণ করি। আমাদের কলেজের ভিপি ছিলেন জালাল ভাই আর সেক্রেটারী ছিলেন বোরহান উদ্দীন। উনাদের নেতৃত্বেই লেখাপড়ার পাশাপাশি

আমরা কাজকর্ম করতাম। মানে রাজনৈতিক বিভিন্ন কাজকর্ম করতাম। এক পর্যায়ে ০৭ ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর মিটিংয়ের দাওয়াত চট্টগ্রামে আসে। বোরহান ভাই আমাদেরকে বলল, ০৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু মিটিংয়ে আসছে তোমরা যাবা। আমরা দু-হাত উঠিয়ে বললাম যে হ্যাঁ আমরা রাজি, আমরা যেতে চাই উনার নেতৃত্বে ০৭ই মার্চের ভাষণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমরা চট্টগ্রাম থেকে যাব সেই কারণে আমরা চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে যাই এবং আমরা এমনভাবে যাই যে ট্রেনটা রিজার্ভ না তবে রিজার্ভ এর মতো। সেখানে অনেক লোক ছিল। পুরো এক ট্রেনই আমরা ছাত্ররা আর অন্যান্য লোকেরা মিলে চলে যাই ০৭ ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর মিটিংয়ে। রাস্তায় অনেক ধরনের ছোট খাট ঘটনাও ছিল সেটা আর আমি বললাম না। ভোরে গিয়ে পৌঁছাই আমরা এবং ট্রেন থেকে নামার পর আমরা কোথায় যাব আর আমাদের কোনো আশ্রয় কেন্দ্রও নাই, হাটতে হাটতে রোসকোর্স ময়দানের পাশে ইউনিভার্সিটির কয়েকটা হল আমরা পেয়ে গেলাম ও কিছু ক্লাসরুম পেলাম, সেখানে গিয়ে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং এক পর্যায়ে আমরা ঘুমিয়ে গেলাম। কেননা তখন খুব ক্লান্ত ছিলাম। যাহোক ১০ টার দিকে আমরা উঠলাম এবং উঠে দেখি আমাদের সামনে হাজার হাজার মানুষ। হাজার হাজার মানুষ বললেও ভুল হবে, লাখ লাখ মানুষ। খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে দেখতে থাকলাম আর হাটতে থাকলাম। এক পর্যায়ে ১২টার দিকে আমরা স্টেইজের দিকে চলে গেলাম। স্টেইজের দিকে এগিয়ে গিয়ে শুনতে পাই মাইক দিয়ে এনাউন্স করছে যে আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছুক্ষণের মধ্যে আসছেন আপনার শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বসে পড়ুন, এরকমই কিছু শ্লোগান দিচ্ছে। আমার একটু ইচ্ছে হলো যে দেখি একটু ঘুরে ফিরে কোথায় কী? আর তখন তো বয়স আমার এমন না, আনুমানিক ১৮/১৯ হবে। একটু সাহস নিয়ে ভাবলাম যে স্টেইজেই উঠে যাই আর দেখি কি হয়। গেলাম কেউ তো আর বাধাও দিল না, হাটলাম ঘুরলাম, ওই দিকে স্টেইজের মাইক দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে কোন বাধা নেই বিপত্তি নেই, একটা আনন্দই লাগলো। তারপর যখন মাইকে বলল যে আপনারা বসেন, সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। আমি পার্শ্বে গিয়ে দাড়িয়ে থাকলাম। বঙ্গবন্ধু আসলেন এবং বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর আমরা তার দুটা কথা শুনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা তো সবসময়ই শুনেন তারপরও আমার দু

লাইন না বললেই নয়- তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। যদি হুকুম দিতে নাও পারি তাও যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাক।" এই সব শ্লোগান বলার পরই আমাদের শরীরে একটা উত্তেজনার ভাব এসে যায়। তখন মনে হয়েছিল এখনই কেন আমরা কোন কিছু করতেছি না অতীতের দু'একটা কথা না বললেই না। পাকিস্তানিরা বিশেষ করে পাকিস্তানিদের সন্তান যারা আমাদের সাথে চলাফেরা করে তাদের কাছে যে কোন কিছুতেই আমরা অবহেলিত ছিলাম। ওরা আমাদের যেভাবে নিপীড়ন, অত্যাচার করতো, হিংসা করতো, প্রতি মূহুর্তে মূহুর্তে আমরা আঘাত পেতাম। নিজে নিজে ভাবতাম এই দেশ আমাদের কিন্তু তারা আমাদের কীভাবে রুলিং করতেছে। একটু বোঝানোর জন্য বলা, শুধু আমি না সবাই সব জায়গা থেকে অবহেলিত। যাহোক মিটিং হলো, মিটিং হওয়ার পর মনের মধ্যে একটা ধারণা নিলাম যে আমাদের কিছু করতে হবে। আর আমাদের নেতা আমাদের তো ধারণা দিয়েই দিলেন। সেটাই লালন করে আমরা আবার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেই রাতের ট্রেনে চলে গেলাম এবং পরদিন ভোরে পৌঁছলাম। আমার সাথে কিন্তু আমার ছোট ভাই ছিল আব্দুস সালাম এবং আমাদের ক্লাসমেট আর কিছু বড় ভাই ছিল। ওখানে যাওয়ার পর, এখন তো আরও শরীরে শক্তি বেড়ে গেছে। আমরা দিক নির্দেশনাও পেয়ে গেছি। এখন থেকে কাজকর্ম একটু গতিতে করতে হবে, ভালো করে করতে হবে। শুরু হল শহরের মধ্যে মিছিল মিটিং। আমরা মিটিং মিছিলে যেতাম, আমরা কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে বের হতাম আর নিউমার্কেট এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মিটিং করতাম। এর মধ্যে পাকিস্তানীরা চাকরী করে বড় বড় অফিসার যেখানে পেতাম যেমন ব্যাংকে, ব্যাংকের ম্যানেজার হতো ওরা, আমাদের ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতাও ছিল না। আমরা শুধু পিওন হতাম। আমাদের দেশের ছেলেরা শুধু পিওন হতো। আর খুব বেশী হলে একাউন্টেন্ট হতো, কিন্তু ম্যানেজার হওয়ার স্বপ্ন আমরা তখন দেখেতে পারতাম না। বিভিন্ন সরকারি অফিস বা বিভিন্ন অফিসে আমরা হামলা চালাই। যেখানে ওদেরকে পাইছি দৌড়ানি দিয়েছি। এর দুই চার দিনের মাথায় চিটাগং মেডিকেল কলেজে একটা বড় আকারে হামলা হল এবং ওরা গোলাগুলি করে আমাদের কয়েকজন লোক মেরে ফেললো। যখনই আমাদের লোক মারা গেল তখনই আন্দোলনটা আরও চাঙ্গা হয়ে গেল।

এভাবেই এগোতে থাকলো এবং ১০-১৫ দিন আমরা এভাবেই কাটিয়ে দিলাম। এদিকে আবার বঙ্গবন্ধুর একটা নির্দেশ আসছে। যে সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে। আর আমরা তখন চিটাগাংয়ে আর আমাদের যদি কিছু করতে হয় তাহলে আমাদের আরও শক্তির দরকার ফাইন্যান্স দরকার, এলাকার সাপোর্ট দরকার। চিটাগাংয়ে থেকে তো সেই শক্তি আমি পাব না। তখন আমি চিন্তা করলাম আমাদের নিজ এলাকায় চলে যাওয়া উচিত, কিছু যদি করতে হয়। ওই দিকে আমার বড় ভাই অধ্যাপক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, উনি তখন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উনিও ওইদিকে ওনার আন্দোলন বা বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে উনি আমাদের বললেন চলো এখানে থেকে আমরা কিছু করতে পারবো না, আমরা বাড়ি চলে যাই। খুব তাড়াতাড়ি ওনার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা (আমাদের সাথে মকবুল ভাই ছিলেন পরবর্তীতে উনি আমাদের ভগ্নিপতি হয়েছিলেন) ট্রেনে করে চলে এলাম সিলেট। বাড়িতে যাওয়ার পর আমাদের মনে তো একটাই যে আমরা এখন কি করবো কীভাবে করবো? একটা পরিকল্পনার দরকার। এক পর্যায়ে আমাদের বড় ভাই মৌলভীবাজারে গেলেন। আহাদ ভাইকে অনেক মানুষ চিনতো। কারণ উনি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারপর মৌলভীবাজারে বিভিন্ন জায়গা উনি দেখলেন। বড় বড় নেতারা যারা আসতো তার কাছে, তাদের নির্দেশনা দিতেন আর আমরাও উনাদের সাথে থাকতাম এবং তারা বলতেন কীভাবে কী করা যায়। যদিও সে সময় আমার বাবার বন্দুক ছিল কিন্তু সেই বন্দুক দিয়ে তো আর যুদ্ধ করতে পারব না। তবুও এক পর্যায়ে রেডি ছিলাম যে বের হয়ে যাব, কিন্তু তারা বললেন যে না আমাদের ট্রেনিং নিতে হবে, প্রস্তুতি নিতে হবে। হবিগঞ্জের কমান্ডার মনি চৌধুরী উনি মৌলভিবাজারে আসলেন এবং সেক্টর কমান্ডারও আসলেন। তারপর আহাদ ভাই গেলেন এবং আমরাও গেলাম এবং আমার বাবাও গেলেন আমাদেরকে নিয়ে। আমার বাবার তখন খুব বেশী বয়স তা না, আমরাতো অনেক কম বয়সী ছিলাম। আমি ১৮/১৯ আর আহাদ ভাই তখন ২৫/২৬ এর বেশী না। যুবকই বলতে হয়। বাবা আমাদেরকে নিয়ে গেলেন, ওনাদের সাথে মিটিং হলো। ওনারা একটা দিক নির্দেশনা দিলেন। দিক নির্দেশনা পাওয়ার পরই আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোথাও না কোথাও যেতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন আমরা প্রস্তুতি

নিচ্ছি, যে দেশের বাইরে যাব এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিব। দেশের বাইরে যাব, কিন্তু ইন্ডিয়া ছাড়া তো আমাদের আর কোন রাস্তা নাই। আপনাদের মনে আছে তখনকার সময় তিন ব্যান্ডের রেডিও চালালে আমরা বিবিসির সংবাদ শুনতে পাইতাম। আর বিবিসি কোথায় কি হচ্ছে সব কিছু বলে দিত। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তিন ব্যান্ডের রেডিও ব্যবহার করতাম। ওখান থেকেও অনেক পরামর্শ আসতো। সর্বপরি আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের বড় ভাইয়ের নেতৃত্বে এবং বেশ কিছু মানুষ আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হল এবং ওরা বললো যে আমরাও তোমাদের সাথে যাব। আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। যাওয়ার প্রাক্কালে আমরা তিন ভাই আমি অগেই বলেছি, আমি আহাদ ভাই আর আব্দুস সালাম এবং আমার ভগ্নিপতি উনিও এই বাড়িতে তখন ছিলেন। আমার চাচা মায়া মিয়া, উনিও আমাদের সাথে আসলেন। উনি একটু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সাথে আরও ৩০-৩৫ জন লোক। আমরা হেটে রওনা দিলাম কিন্তু আমরা কোথায় যাব কোন ঠিকানায় যাব সেটা আমরা জানি না। এক পর্যায়ে ২/৩ টার দিকে শমসেরনগরের পাশে বনু ব্রিজ আপনারা হয়ত নাম শুনেছেন সেই ব্রিজ আমরা ক্রস করলাম কিন্তু সেই ব্রিজ যে ক্রস করব যদি আমরা একসাথে ক্রস করি তাহলে আমাদের বিপদ আছে। কারণ আশে পাশে আর্মি আছে। বনু ব্রিজে আর্মি আছে এবং শমসেরনগরে আর্মি আছে। আমরা দুজন একজন করে ক্রস করলাম এবং রাস্তার ওপার গিয়ে আমরা একসাথে হলাম। মাশাল্লাহ কোন অসুবিধা হয় নি। তবে অনেক সময় লাগছে এবং আমরা আবার হাটা শুরু করলাম। সমস্ত দিন হাটলাম, ইন্ডিয়া বর্ডারের পার্শ্বে এক জায়গায় গিয়ে আমরা উঠলাম। তখন প্রায় রাত ৮/৯ টা হয়ে গেছে। এদিকে হাজার হাজার লোক বিশেষ করে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে লাইন কে লাইন ধরে যাচ্ছে। কিছু কিছু লোক অনেক বৃদ্ধ তাই তাদের দুই সন্তান লাঠির দুই দিকে তাকে মাঝখানে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনও দেখছি তার মাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে গরু ছাগল নিয়েও যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি বলতে কিছু নেই সব হেটে যাচ্ছে। তো আমরা হাটতে হাটতে কৈলাশ শহরে যাই। যদিও কোন ঠিকানা নাই আমাদের কিন্তু ভাবলাম যে কৈলাশ শহরে যাই। মাঝখানে আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি যাওয়ার সময় আমাদের মা, আমাদের বিদায় দিলেন এবং আমার বাবাও আমাদের বিদায় দিলেন। মা ওনার হাতের সোনার গয়নাগুলো আমার বড় ভাইয়ের হাতে

দিয়ে দিলেন। বড় ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন বাবা এটা নেও বিপদে পরলে এটা তোমাদের কাজে লাগবে। আর কিছু পাকিস্তানি টাকা পয়সাও দিলেন। এগুলো নিয়ে আমরা গেলাম আর ওই দিকে আমরা কৈলাশ শহরে পৌছে গেলাম। তখন প্রায় রাত ১২টা, পৌঁছানোর পর আহাদ ভাই একটু হাটাহাটি করল এবং দেখাদেখি করল। উনি যেতেই কিছু লোকজন পেয়ে গেল এবং বলল আমরা তো আসছি এখন কোথায় কি করব? ওনারা বলল যে আপনারা আগে থানায় যান এবং এন্ট্রি করে আসেন। শরণার্থী হিসেবে আমরা থানায় এন্ট্রি করে আসলাম। আমরা চিন্তা করছি যে আমরা রাত কাটাব কোথায়। এই ফাকে আমরা অল্প কিছু খেয়েও নিলাম। তারপর আমরা একটা মসজিদ পেলাম, উপায়ন্ত না পেয়ে আমরা মসজিদে গিয়ে বসে গেলাম এবং যে যেভাবে পারি ঘুমিয়ে পরলাম। ফজর আজানের সময় মসজিদের মোয়াজ্জিন সাহেব এসে আজান দিল আর একপর্যায়ে আমরা উঠে ফজরের নামাজ পড়লাম। নামাজ পড়ে মোয়াজ্জিন সাহেব আমাদের গালাগালি শুরু করল আর বলল এই তোমরা পাকিস্তান খাইয়া আসছো, এখন তোমরা ইন্ডিয়াও খাইবা। তোমরা আর কোনোস্থান পাইলা না। এরকম বলে উনি গালাগালি শুরু করলো। যাহোক আমরা তো নিরুপায়, আমরা এক রাতই ছিলাম, আর থাকি নাই। সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে ওজুখানায় গিয়ে হাতমুখ ধুলাম। আবারও বড় ভাই যোগাযোগ শুরু করলো। এক পর্যায়ে আমাদের এক আত্মীয়র সন্ধান পাওয়া গেল, যে আমার দাদীর আপন বাড়ী (বাপের বাড়ী) সেই কৈলাশ শহরে। তখন বড় ভাই খোঁজ খবর লাগাল যে কে কোথায় আছে। ওনাদের দু'একজনকে খবর লাগাতেই ওনারা আসলো তখন আমার বড় ভাই বললেন আমরাতো এভাবে আসছি, এখনতো আমাদের দেশে থাকা নিরাপদ না। এইরকম ভাষাই বললেন। ওনারা বলল তোমাদের কোন অসুবিধা নাই তোমরা সবাই আমাদের বাড়িতে থাকবা। তাদের বাসাটা হলো কৈলাশ শহর থেকে এক মাইল দূরে। ওনারা আমাদের আশ্রয় দিল, আমরা ওনাদের বাসায় থাকা খাওয়া করতেছি। তবে বড় ভাই অবশ্য এই বাড়িতে থাকে নাই, উনি তো ছাত্র নেতা বড় বড় নেতারা ওনাকে টান দিয়ে নিয়ে শহরের মধ্যে রেখে দিয়েছে। এখন আসতে আসতে রিক্রুটিং শুরু হল এবং ট্রেনিং শুরু হল। এক পর্যায়ে দেরাদুনের একটি ট্রেনিং সেন্টারে লোকজন ডাক দিল আমরা তো চারজন ছিলাম তাই আমাদের

একসাথে না নিয়ে কয়েক জায়গায় দিল। আমার ছোট ভাই সালামকে দিয়ে দেওয়া হলো দেরাদুনে। ও চলে গেল দেরাদুনে। আরও ১০-১৫ দিন পর আমার ডাক আসে, আমাকে দিয়ে দেওয়া হলো আসামের জাফলংয়ে। আমরা যেহেতু ছাত্র ছিলাম আমাদের একটি আলাদা সংগঠন ছিল মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ। মুজিব বাহিনীর বিএলএফ-এর মাধ্যমে আমরা যুদ্ধে সক্রিয় ছিলাম। আসামের জাফলংয়ে প্রায় দেড় মাসের মতো আমরা ট্রেনিং দেই এবং মোটামুটি সব বিষয়েই আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যেমন- আর্মস, এক্সপ্লোসিভ, মর্টার এবং কীভাবে প্লেন ধ্বংস করা যাবে এগুলো। দেড় মাসে আমরা ট্রেইনিং কোর্স শেষ করে চলে আসি। সেখানে আমার ব্যক্তিগত ভাবে আর্মসের ট্রেনিংয়ের রেজাল্ট একটু ভাল আসে। তখন বেশ খুশি লাগে কিন্তু পরে এটা আমার জন্য একটু কাল হয়ে যায়। আমাকে আর্মসের শুটিংয়ের টার্গেটের উপর ভিত্তি করে যাচাই করে আমি ভাল বলে আমাকে এলএমজি দিয়ে দেয়। এলএমজি পাইছি আমি তো প্রথম দিকে মোটামুটি খুশি। এক পর্যায়ে ট্রেনিং শেষে আমাদের রিজার্ভে পাঠিয়ে দিল কুমারঘাটে। ওখানে একটা ক্যাম্প ছিল, যেসব মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষ করে তারা এসে সেখানে থাকে। এখানে খাওয়া দাওয়া সব কিছুরই ব্যবস্থা ছিল। আর এখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সময় প্ল্যান করে যুদ্ধ করার জন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে এসে কয়েকদিন থাকার পর মনের মধ্যে একটা বড় কষ্ট আক্ষেপ আমার বাবা-মা ভাই বোন সহ মোট আটজন ওনাদের ফেলে আসলাম ওনারা কেমন আছেন, কি করতেছে কোন খবর নাই। এখনতো টেলিফোন আছে কত কিছু আছে কিন্তু তখন তো এগুলো ছিল না। মনের মধ্যে অনেক কষ্ট। আরও কষ্ট হল আমার সাথে আমার ভাই ও ভগ্নিপতি এসেছিল ওনাদের সাথেও আমার দেখা নাই। এক ভাই দেরাদুন চলে গেল, আহাদ ভাই কোথায় জানি না, ভগ্নিপতি কোথায় জানি না। মনের মধ্যে বড় আক্ষেপ এখন যুদ্ধের মধ্যে বাঁচবো কি মরবো জানি না, যদি তাদের সাথে একবার দেখা পাইতাম। এর মধ্যে আমাদের সিলেট বিভাগের যে লিডার ছিলেন আক্তার ভাই। ওনাকে বললাম যে আমার বড় ভাইয়ের সাথে আপনার যোগাযোগ আছে কি না, আমার একটু দেখতে ইচ্ছা করছে, উনি বললেন আচ্ছা দেখি কি করা যায়। এর মধ্যে আমাদের মৌলভীবাজারের লিডার ছিলেন মাহমুদ ভাই, তার নামটা বলার কারণ হল আমরা একই শহরের। এক পর্যায়ে আক্তার

ভাই আমাকে বললেন যে তোমার ভাই কৈলাশ শহরে আছেন তুমি যদি দেখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে কাল সকালে ছুটি দিতে পারব তবে তোমাকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। উনি আমাকে ছুটি দিলেন এবং আমি কৈলাশ শহরে গিয়েছি বাসে করে প্রায় ঘন্ট দুইয়ের রাস্তা। সমস্ত কৈলাশ শহর ঘুরলাম কিন্তু যাকে জিজ্ঞাস করি সেই বলে হ্যাঁ দেখছি তো কিন্তু এখন দেখছি না। এই সেই করে করে সমস্ত দিন আমি ঘোরাঘুরি করলাম মনের মধ্যে এমন একটা কষ্ট যে ভাই এখানে থাকা সত্ত্বেও ভাইকে আমি দেখতে পেলাম না। তাই নিরুপায় হয়ে আমি আবার আমার ক্যাম্পে ফেরত চলে আসলাম। তার দুই চার দিনের মধ্যেই আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাংলাদেশে। আমার এখনও তারিখ মনে আছে তারিখটা হলো ১৪ই আগস্ট ১৯৭১। ১৪ই আগস্ট হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আমাদের নেতারা কেন এই তারিখ ঠিক করছে আমরা জানিনা কিন্তু নেতাদের কথাতো আমাদের মানতেই হবে। আমাদের প্রায় ৩৫ জনের একটা গ্রুপ নিয়ে আমরা রওনা দিয়েছি। কৈলাশ শহরের পাশ দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে বনু ব্রিজের পাশে নামিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে একটা বাড়িতে আমাদের রেখেছে এবং বলছে যে আপনারা এখানে থাকেন। আমাদের গাইড বলল আমরা যে রাস্তাটা ক্রস করবো রাস্তাটা গিয়ে একটু দেখে আসি। আমাদের গাইড গিয়ে দেখে ১৪ই আগস্ট এর কারণে পাকিস্তান আর্মিরা একটু ভয়ে ছিল যে আজকে একটা আক্রমণ হতে পারে। সেই সুবাদে এলাকায় যত মানুষ ছিল সবাইকে ডেকে এনে রেললাইনের উপর হাতে হাত ধরিয়ে দাড় করিয়ে রেখে দিছে এবং প্রত্যেকের কাছে একটা হারিকেনও দিয়ে দিছে। সেখানে একটা লাইট পোস্ট ছিল এটা চারপাশ দিয়ে ঘুরছে আর সব দেখা যাচ্ছিল যে কে যাচ্ছে আর কে আসতেছে। তাই আমাদের গাইড এসে আমাদের বলল যে কোন ছিদ্র নাই যে আমরা ঢুকবো। আমরা হলাম গেরিলা আমাদের একটা নীতি হল মারো এবং ভাগো কিন্তু মরবা না। যেখানে মরতে হয় সেখানে যেও না। এখন যদি আমরা ঢুকি তাহলে আমাদের একটা যুদ্ধ করে ঢুকতে হবে। তবে যুদ্ধ করে ঢোকা আমাদের নিয়ম নাই। তারপর আমাদের যে কমান্ডার ছিলেন তাদের সাথে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত হল সেখানে ঢোকার রাস্তা নাই আমাদের ব্যাক করতে হবে। আমাদের তাড়াতাড়ি ব্যাক করতে হবে। না হয় সকালে এসে আমাদের ধরে ফেলবে। আবার হেঁটে আমরা চলে গেলাম কৈলাশ শহরের

বর্ডারে। সেখানে আসার পরপরই আর্মির গাড়ি আসল এবং গাড়িতে আমাদের সবাইকে উঠিয়ে দিল। আমাদের দেশে আসামীদের যেভাবে উঠিয়ে নিয়ে যায় ঠিক সেই ভাবে আমাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওরা আমাদেকে নির্দেশনা মোতাবেক নিয়ে যাচ্ছিল সেখানে বলতে পারতাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। অবশেষে আমাদের নিয়ে চলে যায় তৈল্যাপাড়া বর্ডারে। আমরা যাওয়ার পর দুপুরে খাবার খাওয়ালো। তার পর একটা বাড়িতে নিয়ে রাখল। সন্ধ্যার সাথে সাথে এসে বলল তোমরা রেডি হও রাতে আমরা ঢুকে যাব। আমরা বললাম আমরা এত জার্নি করে আসলাম এখনই চলে যাব, যে হুকুম সেই কাজ। সেই দিন আবার বিকালে বের হয়ে দেখি সেখানে ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা দিবস পালন হচ্ছে। দিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট। অন্যদিকে আমার কষ্টের কথাটা হলো আমার সাথে ছিল এলএমজি, এটার সাথে অনেক সরঞ্জাম ছিল এগুলো নেওয়ার জন্য একটা হেলপার দিবে বলেও দেয়নি। ফলে পরবর্তিতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। যাহোক আমরা যাব সাতগাঁওয়ের পাহাড়ে। দুরত্ব কতটুকু আমার বলা কঠিন। সন্ধ্যায় রওনা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে হাটতে হয়েছে। সাতগাঁওয়ের পাহাড়ের চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর পাশ দিয়ে যে একটা রাস্তা আছে সেখান দিয়ে, এছাড়া আমাদের আর কোন রাস্তা নাই। এই বাংলোতে আর্মিরও বড় বড় অফিসাররা রাতে থাকে। যার কারণে এই এরিয়াটা অনেক কড়া নজরদাড়িতে ছিল। তবুও আমরা প্রায় শেষ রাতের দিকে ক্রলিং করে করে মাশাআল্লাহ পার হয়ে গেছি। অনেক কষ্ট হয়েছে। এক পর্যায়ে আমরা শেল্টারে যাব কিন্তু আমাদের গাইড রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। সে আমাদের বলল আমিতো রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আপনারা এখানে বসেন। আমরা টিলার নিচে আমাদের অস্ত্রগুলো পাশে রেখে বিশ্রাম নিলাম। কিছুক্ষণ পর এসে বলল, রাস্তা পেয়েছি, এখন চলেন। হাটা শুরু করলাম, এখানে একটা জিনিস বলা দরকার হাটা শুরু হলে থামার কোন উপায় নেই। এক পর্যায়ে আমার পা জ্বলতেছে কিন্তু দেখার কোন উপায় পাচ্ছিলাম না। হাত দিয়ে টান দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে দেখলাম যে জোঁক, এভাবে একবার ফেলি আবার হাটি। পা দিয়ে অঝোরে রক্তও পড়ছে। এভাবে আমরা পাহাড়ের টিলার নিচে আশ্রয় নিলাম। এক বৃদ্ধা লোক একটি ছোট ছনের ঘরে থাকে। মানে গরিবদের যে রকম থাকে আরকি, ওনার একটা গরুর ঘর ছিল উনি আমাদের ডেকে বললো যে দেখেন আপনারা

আসছেন কিন্তু আমার এই একটাই ঘর, বলেন আমি আর কি করতে পারি। আমরা বললাম ঠিক আছে আমরা দেখছি। আমরা সবাই মিলে ঘরটি পরিষ্কার করে জঙ্গল থেকে পাতা আর ইটা এনে পাতা দিয়ে বিছানা আর ইটা/ব্যাগ/ম্যাগাজিন দিয়ে বালিশ বানালাম। এভাবেই আমরা এখানে থাকি। ৫-৭ দিন পর খবর আসলো পাহাড়ের টিলার নিচে গ্রেনেড পাওয়া গেছে। বাজারে খবর শুনছিলাম, পাওয়ার পর আমাদের মধ্যে চিন্তা ঢুকে গেল। মিলিটারি খাসের পাহাড় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা থাকতে পারে বলে ধারণা করেছিল। তাই আমরা বৃদ্ধাকে ডেকে বললাম যে আশেপাশে এমন কোন জায়গা আছে কি না যে পাকিস্তানিরা যেতে ভয় পায়। সে বলল আছে তো, ওই যে বাঘের পাহাড়। আমরা বললাম যে বাঘের পাহাড় কত দূর। সে বলল এই তো এক থেকে দেড় মাইল। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদি আমাদের যুদ্ধটা ন্যায় হয় তাহলে বাঘে খাবে না, আর যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে বাঘে খাবে। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, আমরা ভাবলাম যে আমরা ওখানে থাকবো তা খাব কি? আমরা চাউল ভেজে যার যার পকেটে এক মুঠ করে নিয়ে চলে গেলাম। এই বাড়িতে আমাদের কোন চিহ্ন ও রাখি নি। তো সেখানে যাওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বাঘে খাইলে খাইয়া ফেলাক কেউ গুলি করবা না। আমরা কোন আওয়াজ ব্যতীত দিন কাটাইয়া চলে যাব। আমরা সেখানে অনেক গন্ধ পাচ্ছিলাম আর বোঝা যাচ্ছিল এখানে জন্তু আছে। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা হয়ে যায় আর আমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কেনান এখানে থাকা সম্ভব না। তো আমরা আস্তে আস্তে টিলাতে উঠে খোজ নিলাম যে পাকিস্তানীরা আসছিল কি না। কিন্তু না তারা খাসিয়া বাজার পর্যন্ত এসে চলে যায়, এখন আমরা সেইফ। আমাদের আরেক লিডার তার নাম হলো দেওয়ান আব্দুল ওহাব। উনি আমাদের রেখে চলে গেছে নবীগঞ্জে। আমাদেরকেও এখন নবীগঞ্জে নিয়ে যাবে। এখানে দেওয়ান আব্দুল ওহাব ও মুকিত ভাইয়ের দুই গ্রুপ এক হয়ে গেছি। যাহোক দেওয়ান আব্দুল ওহাব ঘুরে আসল এবং সাথে করে নৌকা নিয়ে আসল। দেওয়ান আব্দুল ওহাব ছিল মৌলভীবাজারের লিডার আর আমার লিডার ছিল মুকিত ভাই যিনি পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে হত্যা হয়েছিলেন। উনি এসে বলল যে আমার নৌকা ছোট তো আমরা দুই ভাগ করে যাব কিন্তু আমরা কেউ রাজি না কেননা আমরা মরলে এক সাথে আর বাঁচলে এক সাথে

বাঁচবো। এদিকে আমরা খাওয়া দাওয়া নিয়ে কষ্টে আছি। বৃদ্ধ লোকের দুই জনের সংসার ছোট একটা পাতিল আর উনাকে যদি বাজারে পাঠাই মানুষ বলবে তুই এত ছোট সংসারে এত বড় পাতিল কেন কিনছো? আর একটা জিনিস বলি আমরা যখন রওনা দেই আমাদের নেতারা যুদ্ধের খরচের জন্য ১০০ টাকা করে দিয়েছিল। আমরা বড় পাতিল কিনতেও পারি না আবার টাকা যা আছে তা খরচও করতে পারছি না। কেননা আমাদের একটু হিসাব করে চলতে হচ্ছে। দেওয়ান ওহাব ভাই অর্ধেক নিতে বললে আমরা রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত উনি বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে গেল। মাঝি বলল, চলেন আল্লাহ ভরসা। আর মনে মনে ধারণা মরলে পানিতে মরব পাকিস্তানিরা তো আর মারতে পারবে না। আল্লাহ নিলে নিয়ে যাক। তারপর সমস্ত রাত নৌকায় থাকার পর আমরা নবীগঞ্জে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে একটা বাড়িতে যাওয়ার পর বাড়ির মালিক মো: জহির সাহেব আমাদের খাসি জবাই করে খাওয়ালো। আর বলল আপনারা আসছেন আমার কর্তব্য আমি পালন করবো, তবে কোন দিন কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমার পরিবারের প্রতি আপনারা খেয়াল রাখিয়েন। দিনে আমরা তার বাড়িতে খেলাম, আর রাতে গ্রামের সবাই এসে আমাদের দুই জন, তিন জন করে নিয়ে যায়। এভাবে করে আমরা সুন্দর ভাবে সারা গ্রাম মিলে থাকি। আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। আমি ওই গ্রামকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এত সুন্দর করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। দুই তিন দিন পর মুকিত সাহেব আমাকে রাজনগর কিভাবে যাওয়া যায় সেই দায়িত্ব দেন। কেননা আমার বাড়ি ছিল রাজনগর আর মুকিত ভাইয়ের বাড়ি ছিল মৌলভীবাজার। রাতে আমি রবকে সাথে নিয়ে মৌলভীবাজার এর হারুন আর মতিনকে নিয়ে রওনা দেই। হারুন আর মতিন মৌলভীবাজার পর্যন্ত যাবে। আমরা এখন সিভিলে যাচ্ছি আমাদের গাইড লাইন তৈরী করার জন্য। যাওয়ার পথে ভাতগাঁও নামক এক গ্রামে মতিনের আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মতিন তার আত্মীয়কে কানে কানে বলল আমরা এই কয়েকজন আসছি আমাদেরকে পারলে কিছু রান্না করে খাইতে দাও আমরা আবার চলে যাব। সেই আত্মীয় আমাদের তাড়াতাড়ি ডিম ভুনা করে ভাত খাওয়ালো। ওই ডিম ভুনা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ খাবার ছিল। আমি আর কোন দিন এত মজার ডিম ভুনা খাই নাই। এছাড়া তখন ক্লান্তও ছিলাম। তারপর

ওনাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার বের হয়ে গেলাম। যাওয়ার পথে খালিশপুর আর মইনপুরে দুই ফুফুর বাড়িতে যাওয়ার প্লান করলাম। কেননা তারা আমার কোন ক্ষতি করবে না। আর এমনিতে আমরা তো বাসে উঠতে পারব না। কারণ আমাদের মতো যুবক দেখলে তো ধরে ফেলবে। খালিশপুর যাওয়ার পথে রাস্তার একটা ঘটনা, সেটা না বললে হয় না, যে আল্লাহর কতটুকু মেহেরবানি ছিল, আর দেশ স্বাধীনের পিছনে আল্লাহর সরাসরি সহযোগীতা ছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি পাশে দুইটা লোক ধানের চারা রোপন করতেছিল, হঠাৎ একটা লোক আমাদেরকে দাড় করিয়ে বলল তোমরা কারা আর কোথায় যাচ্ছ? আর সে বলল যে অপরিচিত লোকজন এখান দিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। চল তোমাদের পিচ কমিটিতে নিয়ে যাব। আমি তাকে আমাদের ভাষায় বললাম, আমরা অপরিচিত না, আমরা ওই সামনে তোতা মিয়ার বাড়িতে যাব। সে আমার খালু হন, সে তারপরও মানছে না। একসময় আমি প্রস্তুতি নেই যে গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দিব, কেননা পিচ কমিটির কাছে গেলে তো শেষ। যাহোক হঠাৎ করে পাশের লোকটা বলে যে "এই তুই ওকে আটকাইছ কেন? আমি ওকে চিনি। তারপর সেই লোকটা বলল তুই কীভাবে চিনিস? সে আবার বলল যে দেখ আমি ওকে চিনি এখন ওদেরকে যেতে দে" আল্লাহর একটা অশেষ রহমতে আমরা সেখান থেকে বেঁচে যাই। আরেকটা কথা হলো আমার জীবনেও আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাইনি আর সে আমাকে কিভাবে চিনবে। এটা আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছু না। যাওয়ার পর একটা পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধুইলাম রাস্তায় অনেক কাঁদা পানি ছিল। এখন আমরা দুই জন আমি আর রব। বাকি দুজন পাশের গ্রামে চলে গিয়েছিল। গিয়ে ফুপুকে বললাম ফুপু আব্বা আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। ফুপু বলল যে তোমরা এখানে আসছো কীভাবে? আমি বললাম, আমরা চিটাগাং ছিলাম সেখান থেকে হাটতে হাটতে আসছি। বহুত দিন লেগছে চিটাগাং থেকে আসতে। এমন কথা সাজিয়েছি যে ফুপু কনভেন্স হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে ফুপুর শশুর উনি আমাকে দাদা ডাকেন, সে আসলো এবং আমাদের সাথে গল্প করল। আমার প্লান ছিল যে যদি ফুপুকে সাথে নিয়ে যাই তাহলে একটু সুবিধা। এক পর্যায়ে ফুপু এসে বলল, না এখন আমি যেতে পারবো না। দাদা আমাদের ব্যাপারে বুঝে ফেলেছেন, আর বলছেন যে তোমরা আরেক ফুপুর বাড়িতে চলে যাও রাস্তা পার করে দেওয়ার দায়িত্ব

আমার। আমাদের খাবার খাইয়ে উনি আমাদের নদী পার করে দিয়েছেন, আমরা ওই ফুপুর বাড়িতে চলে গেলাম। ওই ফুপুর বাড়িতে যাওয়ার পর আবার সেই ফুপুকে আগের সেই ডায়লগ দিয়েছি। সে বলল যে দেখি। এখানে আবার বাতাস অন্য রকম আওয়ামী আওয়ামী মুক্তি মুক্তি। তো একটু সাপোর্ট আছে দেখলে তো বোঝা যায়, কিন্তু আমরা পরিচয় দেই নি। আমরা কীভাবে যাব সেই প্লানিং করছিলাম কেননা আমাকে আর্মস নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা বের করতে হবে। ফুপুকে বললাম যে ফুপু চলেন আমরা যাই। কীভাবে যাব? অনেকে বলে যে বাসে যাও আবার অনেকে বলে যে নৌকায় যাও কিন্তু একজন বলে যে নৌকার ভাড়া তো অনেক বেশী। আমি বললাম কত? সে বলল যে ১০০ টাকা। আমার কাছে তো সেই একশ টাকা আছেই। আমি বললাম সমস্যা নাই। ফুপু, আর ওনার ছোট মেয়েসহ আমরা দুজন গেলাম। সকাল থেকে প্রায় ২/৩ টা পর্যন্ত নৌকা চলছে তার পর রাজনগর এর কাছাকাছি একটা ব্রিজের কাছে গিয়ে নামিয়ে দিল। আমারদেও বাড়ি এখান থেকে বেশী দুরে না কিন্তু যাওয়ার পথে দেখি একটা রাজাকার ক্যাম্প, এখন আমি টেনশনে পরে গেলাম। উপস্থিত বুদ্ধি করে আমার ছোট ফুপাত বোনকে কোলে নিয়ে তাকে চিমিটি কেটে কাঁদালাম আর আদর করতে করতে হেটে চলে গেলাম। এলাকায় আমাকে বেশী একটা চিনে না, কেননা আমরা কেউ এলাকায় বড় হই নাই। যাহোক নির্জন এলাকা আর আমরা আস্তে করে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে পরেছি। আর তখন আমার ছোট বোন তার নাম হল শেলী আমাকে দেখে চিৎকার করে বলে মেঝ ভাই। তখন আমি তাকে চুপ করতে বলি। অন্যদিকে খবর আসে আমাদের একজন পাকিস্তানিদের হাতে ধরা খেয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য নেয়। আমাদের প্রথমে যে বাড়িতে খাসি দিয়ে ভাত খাওয়ায়ছিল সে বাড়ি খানাও তারা উড়িয়ে দেয়। ওই দিকে আমার সম্পূর্ণ গ্রুপই কিন্তু ওইখানে ছিল। এর অগেই আমার লিডার আর টিমের বাকি সবাই যখন খবর পায়, আস্তে করে সেই বাড়ি থেকে সরে যায়। আর পাকিস্তানি আর্মি সেই বাড়িতে গিয়ে সেই বাড়ির মালিককে তাদের জীপের পিছনে গলায় রশি বেধে সেখান থেকে মৌলভীবাজার নিয়ে আসে। অন্যদিকে মুকিত ভাই চিন্তা করতে থাকে যে কী করবে। যে কোন উপায়ে বাঁচাতে হবে। তারা প্রথমে যে ভুলটা করে রাজনগরে না এসে তারা আবার ইন্ডিয়া যাবে। এলাকায় কিছু লোক খুজতে শুরু করল যে

তাদেরকে ইন্ডিয়ায় পার করে দিবে। এক পর্যায়ে একটা লোককে তারা খুজে পায়। সে বলে যে আমি তোমাদেরকে ইন্ডিয়ায় পার করে দিব। তোমরা এইভাবে ওইভাবে যাবা। তাদেরকে তার পরামর্শ মোতাবেক যেতে হবে। তারা তার পরামর্শ মোতাবেক যাইতেছে। আসলে সে গাইড ছিল পাকিস্তানিদের পক্ষের লোক। আর সে প্লান করে রাস্তায় ওদেরকে মোট ০৫ জনকে ধরিয়ে দিল। সেখানে ০৪ জনকে তার সামনেই গুলি করে মেরে ফেলল আর মুকিতকে ধরে নিয়ে আসল আর্মির বড় অফিসারের কাছে। সেখানে মুকিতকে দুই হাত পেছনে বেধে তাকে বলতেছে ওই মুক্তি কা বাচ্চা তোর বন্ধুরে তো খাতাম কার দিয়া, আবি তোমকা কেয়া বত হে। আর পাশাপাশি তাকে গালাগালি করতেছে। অন্যদিকে তাকে অনেক প্রশ্ন করতেছে আর গালগালি করতেছে। এক পর্যায়ে সে সহ্য করতে না পেরে তার মুখের থুথু আর্মির অফিসারে মুখে মেরে দিছে। থুথু মারার পর আর্মি তার সাথের লোক জনকে ডাক দেয় "হেই তুম লোক কাহা হে" ০৪-০৫ জন আসার পর সে বলতেছে "মুক্তি কা বাচ্চা হামকো থুথু মারা হ্যা" তখন তারা তাকে পর্যাপ্ত ভাবে মারে এবং এক পর্যায়ে তারা তার দু হাত ও দুই পা ধরে টান দিলে তার হাত পা ছিড়ে যায়। এরকম ঘটনা আমাদের অনেক কষ্ট দেয় আর কান্না তো আছেই। এভাবেই আমার সাথের সবাই শেষ হয়ে গেল। আমি আজ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এই বীর ৫ মুক্তিযোদ্ধা যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে বেহেশত নসিব করেন। তাদের সবার নামগুলো ঠিক মনে নেই তবে তাদের মধ্যে মুকিত ভাই, রানু আর সুদর্শন (সেই হিন্দু ছেলে) ও ছিল ওখানে। আমি অনেক দিন আগে খবর পেয়েছি যে মৌলভীবাজারে একটা হল ছিল জিন্নাহ হল নামে। সেই হলের নামটা বদলী করে মুকিত হল করা হইছে। একটা মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্য জীবন দিল তার জন্য একটা হলই সব না। তার নামে একটা হল নামকরণ করে তার ঋন শোধ করা যাবে না। এদের বিনিময়ে আমরা দেশ পেয়েছি, তাদেরকে আরও কিছু সম্মান করা যেতে পারে। আমার প্রস্তাব হলো এই পাঁচ মুক্তিযোদ্ধার নামে পাঁচটা রাস্তার নামকরণ করা হোক। অন্ততপক্ষে তাঁদের মানুষ মনে রাখবে এবং তাদেঁর বাবা-মা শান্তি পাবে। এখন আসা যাক আমি আর আমার বন্ধুর কথায়। এসব ঘটনা যখন শুরু হল তখন আমি বাড়ি থেকে ভেগে গেলাম। এটা ওই সপ্তাহর ভেতরেরই ঘটনা ছিল। ভেগে আমি আমার কাজকর্ম করছি এবং আমার

লিডার যে মাহবুব ভাই তার সাথে যোগাযোগ রাখছি। এক পর্যায়ে আমিও পাকিস্তানি আর্মির হাতে ধরা পড়ে যাই। তারা আমাকে ধরে সার্কিট হাউজে নিয়ে যায় এবং নেওয়ার পর আমার উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে আমি মনে করেছি যে আমি শেষ । আমাকে দিয়ে গর্ত খোড়ালো এবং বললো এই গর্ত তোমার জন্য। আমাকে দিয়েই আমার গর্ত খোড়ালো। আমি তখন আর কি করব তাদের কথা তো মানতেই হবে। তো এক পর্যায়ে আব্বা খবর পেল যে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। সে এই কথা শুনে পাগলের মতো হয়ে গেল। হঠাৎ সে জানতে পারে যে একটা লোক আছে এই লোকটা যদি পাকিস্তানী আর্মিদের সুপারিশ করেন তাহলে এটা সমাধা হতে পারে। আব্বা উনাকে জানালো আর এক পর্যায়ে ওই লোক আর আব্বা গেলেন আর্মি অফিসারের কাছে এবং উনি বললেন যে অফিসার এরা অনেক ভালো মানুষ এরা কোন খারাপ কাজ করতে পারে না। আপনি ওকে ছেড়ে দেন আমার জিম্মায়। উনি খুব পাওয়ারফুল ছিল। তখন একটা শর্ত দিল যে ছাড়তে পারি কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে এসে হাজিরা দিতে হবে। উনি বলল হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নাই। আমাকে ছেড়ে দিল আর এইদিকে আমাকে যে শাস্তি দিচ্ছিল তার পুরোটা আমাকে দিতে পারে নাই। কারণ তিনি প্রথম দিনেই আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তখন আমি চলে আসি আর তখন ডাবল রোল করার প্লান করি তাদের সাথেও ভাল আর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তো আছেই। আর আমার যে আরও দুই ভাই মুক্তিযোদ্ধা তারা সেটা জানত না। এলাকার মানুষ আমাদের চিনে ও না। আমি এখন পুরো দমে কাজ করছি। এদিক ওইদিক দুইদিকের কাজ এবং এটা অনেক রিস্ক ছিল যে কোন সময় যদি প্রকাশ পেত তাহলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত। আর এদিকে আমার কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে এসে হাজিরা দিতে হয়। তাদের কাছে এসে বানিয়ে হোক আর বুদ্ধি করে হোক একটা কিছু বলতে হত। আর ওদিকে আমার কাজ চলতেছে আর আমার লোকজন আসতেছে। এর মধ্যে আহাদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ আহাদ ভাই তখন দেশে আসতে বাধ্য হলেন, কেননা তার একটা গ্রুপ খুব কঠিন একটা বিপদে পড়ছে দেশে। সে দেশে আসে এবং আমি উনাকে গাইড দিয়ে আনি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত, উনাকে এক রাত রাখতে পারছি বাড়িতে। কারণ আমি তো এখন ফ্রি লোক। এক পর্যায়ে আহাদ ভাই দুই তিন দিনে তার কাজ শেষ করে এর মধ্যে আমার আব্বার সাথে দেখা করতে যায় তখন আব্বা

বলেন, আর কত দিন এভাবে থাকবি। তখন আমার ভাই বলেন আব্বা কোথাও বেড়াতে গেলে আমাদের শার্ট, প্যান্ট, জামা আয়রন করতে হয় বা প্রিপারেশন নিতে হয় তো আমরা এখন সেই রকম প্রিপারেশন নিচ্ছি। আমার আব্বারও কিছু কথা না বললেই নয়, আমার আব্বা কুলাউড়া একটা টি গার্ডেনের ম্যানেজার ছিলেন আর ওই গার্ডেনের মালিক কীভাবে যেন জানতে পারলেন তার ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধা তখন সে আব্বার চাকুরী খেয়ে ফেলেছে। আমরা আট ভাই তিন বোনের সংসার শুধুমাত্র আব্বার আয়ের উপর ভিত্তি করে চলতো। আজ বলতে কষ্ট হয় আমাদের পরিবারের সদস্যরা অনেক না খেয়ে থাকতে হইছে। কারণ চাকরীর পয়সা নেই, নয় মাস চাকরী নাই, একটা পরিবার চলে কীভাবে, পরিবার তো অনেক বড়। আর উনার আরেকটা বড় গুণ হলো তিনি তো ব্রিটিশ আমলে আর্মিতে ছিলেন। উনিও মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে, তার মনেও অনেক স্পীড ছিল আর স্পীড না থাকলে তার ছেলেদের কি মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতেন। আর একটা ব্যাপার হলো উনি যদি জানতে পারতো যে কোথাও মুক্তিযোদ্ধা আসছে তখন উনি খাবার রান্না করে নিয়ে দিয়ে আসতো। আর আম্মা এটা সাদরে রান্না করে দিত। আজকে আম্মা আব্বা চলে গেছেন ওনাদের এই দায় আর কেউ স্বীকার করুক আর না করুক আমরা তো করি, আমরা তো দেখেছি। আল্লাহ ওনাদেরকে বেহেশত নসিব করুক। আর আব্বার এই চাকুরি না থাকায় আমাদের পরিবারে অনেক অভাব গেছে। কিন্তু আব্বা যেখানে চাকুরী করতো পরবর্তীতে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পর মালিক এসে আবার আব্বাকে নিয়ে বসিয়ে দেয়। একবার বলাও লাগে নি আর অনেক সম্মানের সহিত নিয়ে গেছে। এদিকে আহাদ ভাই যখন রেড সিগন্যাল দিল, আমি আহাদ ভাইয়ের সাথে গিয়েছি, ওই সেই কৈলাশ শহরে এবং বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেছি, আক্রমণ করেছি, আর্মির গাড়ি গেছে সেখানে এ্যামবুস করে, গ্রেনেড মেরে গ্রুপকে মারছি। খুব বেশি একটা যুদ্ধ করার সুযোগ পাই নাই। আমাদের তো আগে আগে দৌড়াইতে হয়েছে, হিট এন্ড রান পলিসির কারণে আমাদের গ্রুপ তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার ক্ষেত্রে আমি যখন ওদের হাতে ধরা খেলাম তারপর থেকে আমি ফ্রি হয়ে গেছি। যার ফলে আমি অনেক কাজ করতে পেরেছি। অনেক বিপদ থাকা সত্ত্বেও আমি সাহসের সহিত কাজ করে গেছি। মুন্সিবাজারে যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধতে আমি অংশগ্রহণ করি আহাদ ভাইয়ের সাথে। যখন

মুন্সিবাজারে যুদ্ধ করে আমরা জয়ী হয়ে যাই তখন আর্মিরা ওখান থেকে পালিয়ে যায়, হামলা টামলা করে ওদের অনেক মানুষ আমরা মেরেছি। তারা আমাদের হামলা করতে পারে নাই। আর মৌলবীবাজারে আমাদের যুদ্ধ করতে হয় নাই তারা পালিয়ে চলে গেছে। এক পর্যায়ে সারা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে ১৬ই ডিসেম্বর। মনে হয় ৮ তারিখের মধ্যে আমাদের মৌলভীবাজার মুক্ত হয়ে গেছে। আর একটা ঘটনা না বললেই নয়, আহাদ ভাইয়ের নেতৃত্বে যখন আমাদের গ্রুপ নিয়ে চলে যাই, তখন সরকারি স্কুলে আমাদের ক্যাম্প হয়, সবাই থাকার জন্য। আহাদ ভাইয়ের অনেক বড় টিম ছিল এবং মৌলবীবাজার তার নেতৃত্বে চলত। তখন মৌলবীবাজারে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে সেটার জন্য লোকজনকে ডেকে আনে। সবাই একটু ভয়ে ভয়ে আসে কথা বলে সবাইকে মুক্তি দিয়ে তাদের কর্মস্থলে ফিরতে আহাদ ভাই সহায়তা করেন। তখন সরকারি হাই স্কুলে আমাদের যে ক্যাম্প, সে ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিল আমাদের সোলেমান উনিও সিএনসি স্পেশাল ব্যাচের আর আহাদ ভাইও সিএনসি স্পেশাল ব্যাচের ছিলেন। ক্যাম্পে অনেক মাইন পুতা ছিল তো সেগুলো উঠিয়ে উঠিয়ে রাখা হচ্ছে একটি রুমে কারণ মানুষকে তো নিরাপদ করতে হবে আর সেটার দায়িত্বে ছিলেন সোলেমান ভাই। একদিন সে আহাদ ভাইকে গিয়ে বলে স্যার আমার তো মা বাবা নাই আমার একটা বোন আছে বাড়ি ফেঞ্চুগঞ্জে, আমারে একটু ছুটি দেন আমি বোনটাকে একটু দেখে চলে আসি। আহাদ ভাই রাজি হল আর বলল আমি একটু রেশনের টাকা আনার জন্য যাচ্ছি এসে তোমাকে ছুটি দিয়ে দিব। আমাকে সে বলল মজিদ ভাই তোমার তো মটরসাইকেল আছে, আমাকে একটু ফেঞ্চুগঞ্জে নিয়া যাবা, আমার বোনটারে একটু দেখে আসতাম। আমারও ভাল লাগত তাই আমি বললাম ঠিক আছে। তো বিকালে দেখি তার মন খারাপ সেই কারণে আমি গিয়ে জিজ্ঞাস করলাম যে তোর মন খারাপ কেন? সে বলল স্যার চলে গেল কিন্তু আমারে ছুটি দিল না। তো আমি বললাম আমি তো তোমাকে বলছি নিয়ে যাব। তারপর তাকে বললাম যে চল তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসলাম। ওখান থেকে বেশি দূরে না কাছেই। আসার পর আমার মা রান্না করে খাওয়ালো আমরাও খাইলাম। পরে আবার তাকে দিয়ে আসি। পরদিন আহাদ ভাই আসবে আর আমি কোন একটা কাজে রাজনগর থানায় যাই। তখন কোন ফোন ছিল না কিন্তু রিং ফোন ছিল।

হঠাৎ থানার ওই ফোনে খবর আসে যে মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল ক্যাম্পে মাইন ব্রাস্ট হয়ে সব শেষ। আওয়াজ কিন্তু আমিও পাইছি কিন্তু দূরে তো এত আওয়াজ পাওয়া যায় নি। তখন আমার মনের ভিতর অনেক ভয় লাগল যে আমার বড় ভাই, ছোট ভাই এবং ভগ্নিপতি সেখানে এছাড়া আরও কত লোক। আর বিশেষ করে এই তিন জন তো আমার আপন লোক আর আমি তখন রাজনগরে। আমি মটর সাইকেল নিয়ে চলে যাই সা সা করে। যাওয়ার পর দেখি তখনকার মুক্তিযোদ্ধা আর্মির ক্যাম্পের সামনে বেরিকেট দিয়ে রেখে দিছে। আমি গিয়ে বললাম যে আমি দেখি ভিতরে যাব। ওরা বলে যে না ভেতরে এক্সিডেন্ট হইছে ভেতরে যাওয়া যাবে না। আমি বললাম যে আমাকে যাইতেই হবে কিন্তু তারা আমাকে ছাড়তেছে না। তো আমি বললাম যে আমার তিন ভাই এখানে তখন তারা আমাকে বলল আপনার ভাই কে? আমি বললাম যে আহাদ চৌধুরী। তারা বলল যে তার কিছু হয় নাই সে এখানে নাই। পরে বললাম যে সালাম আর মকবুল হোসেন তারা কোথায়? তখন বলে যে আমরা বলতে পারব না। ২০০-৩০০ হাত দুরে লাশ আর লাশ কোন কোন লাশের মুখ পুড়ে গেছে আবার কোন লাশের হাত, পা, শরীর দূরে পড়ে ছিল আমি তখন ভাবলাম আহাদ ভাই তো দুরে তাহলে সালাম আর মকবুল কোথায়। তখন আমি তাকে খুঁজতে গিয়ে পাগল হয়ে গেলাম আমি তো তাকে চিনতে পারতেছি না। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো যে ছোট বেলায় তার হাতে একটা ফুল ছিল তো আমি সেই সূত্র ধরে খুঁজতে লাগি, হঠাৎ করে একজন এসে বলল যে তুমি কি খুঁজ? তখন আমি বললাম যে আমার ভাই সালামকে। তখন সে বলল ও উনি তো হাসপাতালে। আবার জিজ্ঞাস করলাম যে উনি কেমন আছে, সে বলল, ভাল আছে। তখন সে আমাকে নিয়ে যায় সেই হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে দেখি যে তাকে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে আমি গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। আর সে লাফ দিয়ে উঠে আর বলে আমি কই আমি কই। আর যখন মাইন ব্রাস্ট হয় সেখানে আরেকটা ঘটনা আছে মাইন ব্রাস্ট হওয়ার আগে সোলেমান একটা জায়গায় বসে আছে আর সেখানে একটা একটা লোক মাইন উঠিয়ে এনে সোলেমান ভাইয়ের কাছে জমা দিতে আসে। তখন মাইন টা রাখার সময় তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং সেটা ব্লাস্ট হয়ে যায়। সেখানে সালাম ছিল কারণ দুপুরের খাবারের সময় একটু খাবার কম হয়ে গিয়েছিল আর তখন সালাম গিয়ে সবাইকে সান্তনা দেয়

যে বিকেলে ভাল খাবার হবে, এখন সবাই একটু কষ্ট করে খেয়ে নাও। আর তার ঝামেলা মেটানোর কারন হলো সে তো আহাদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার একটা দাপট তো আছেই। আর দুই একজন মুক্তিযোদ্ধা ঝগড়া করতেছে। পরে সে বলে যে তোমরা ঝগড়া কইর না আমি দেখছি, এই কথা বলে খাবার দাবার সব রেডি করতে গেল। ঠিক সে সময় মাইন ব্লাস্ট হয় সালামের তো ট্রেনিং নেওয়া ছিল, আর তার পাশে একটা ড্রেন ছিল তো সে মোতবেক জ্যাম মারলো আর ড্রেনে পরে যায় আর তখন তার পা উপরে পরে আর মাথা নিচে। তখন মাইন এর সেল তার পায়ে এসে পরে ক্ষত হয়। তার এই ইঞ্জুরিটা এখনও আছে। যাহোক পরবর্তীতে আহাদ ভাই আসে এবং খোজ খবর নেয়। তখন প্রায় ২৫-৩০ জন এর মতো মারা যায়। তাই আজকে তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই কেননা আজকে তাদের জন্যই আমরা এই দেশটা পেয়েছি। আর যতটুকুই হোক আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতেছি। কিন্তু তারা তো আর দেখে যেতে পারলো না। এর পরে আমরা বিজয় পেয়ে গেলাম। ১৬ই ডিসেম্বর যে দিন হ্যান্ডওভার হয়। তখন আমারও সুযোগ হয়েছিল, ইয়াং ছিলাম, মৌলভীবাজার থেকে ঢাকায় গিয়ে বিজয় দিবস উৎযাপন করি। এখান থেকে বাসে করে আমরা বিরাট গ্রুপ নিয়ে ঢাকায় গিয়ে আনন্দ উল্লাস করেছি এবং বিজয়ের জয়গান গেয়েছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
এহসান কবির রমজান
নারায়নগঞ্জ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, আমি তখন শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘরের সাথে ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের এর সাথে জড়িত ছিলাম, তখন বাংলাদেশর আন্দোলন তুঙ্গে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিরাট জয় হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পরেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা দিচ্ছে না, এজন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশে। পাকিস্তান সরকার আন্দোলন থামানোর জন্য কারফিউ দিতে থাকে আর বাংলাদেশের ছাত্র জনতা কারফিউ ভেঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের তখনকার আন্দোলন এতোই তুখোর ছিল যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমি তখন বিভিন্ন মিছিল-মিটিং ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতাম, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আমি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনি, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণেই ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাধীনতার, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, পাকিস্তানি দের সাথে আমাদের এদেশের আর কোন আতাত থাকবে না, ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সেই দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের। তখনই আমাদের ভিতরে প্রস্তুতি এসে যায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া

লাগতে পারে। পাকিস্তানী সরকার টালবাহানা শুরু করে, ৩ তারিখ অধিবেশন ঘোষণা করল, কিন্তু ৩ তারিখে অধিবেশন হলো না, এভাবে বিভিন্ন তারিখে টালবাহানা করতে থাকে, এদিকে পাকিস্তানিরা তাদের দেশ থেকে আমাদের দেশে অনেক সেনা সদস্য নিয়ে আসে, এই সেনাবাহিনী আনা-নেয়াতে আমাদের দেশের যে সমস্ত আর্মি অফিসার ছিল তারা কিছুটা আচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করল এবং মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল।

তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশর স্বাধীনতার জন্য যার যা কিছু আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিলাম। পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম অত্যাচার শুরু করলে প্রায় সারা বাংলাদেশের জনগণ একত্রিত হয়ে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য কিছু কিছু রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্য বাদে।

২৭ শে মার্চ রাতে আমাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ফেলে, আমাদের বাড়ি একদম রাস্তার পাশেই ছিল, তখন থেকে আমার মনে আরো বেশি ক্ষোভ জাগে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে, আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, আমরা এই আশা নিয়েই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে যাই এবং সেখানে আমরা ট্রেনিং গ্রহণ করি।

ভারতে যাওয়ার পূর্বে পাকিস্তানি বাহিনীর জ্বালাও-পোড়াও চালানোর পর আমরা কিছুদিন আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে থাকি, কয়েকদিন পর আমরা শুনতে পেলাম ভারতে আমাদের কিছু সেনা বাহিনীর দ্বারা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতেছে, এলাকা থেকে প্রথমে শ্রমিক নেতা আশেক আলী মাষ্টার সাহেব, ছাত্র নেতা আব্দুল মতিন, খেলাঘর শিশু কিশোর সংগঠনের সংগঠক আব্দুল আজিজ, আর ন্যাপের নেতা আবদুস সোবহান এই চারজনকে হঠাৎ করে আমরা তাদের দেখতে পাই না, পরে শুনতে পেলাম তারা ভারতে চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর জন্য। এর ভিতরে একটা কথা মনে পড়ে, যে আজিজ ভাইয়ের কথা বললাম তিনি আমার মামাতো ভাই, আমরা একসাথে রাতে ঘুমাতাম, তিনি যেদিন চলে যাবেন তা আমাকেও বলেন নাই, সকালে উঠে দেখি তিনি নেই।

পরের দিন তার মা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু আমি তাকে কোন উত্তর দিতে পারি নাই কারণ আজিজ ভাই আমাকেও বলেন নাই তিনি ভারতে যাবেন। এই সময় ভারত থেকে আবার আমাদের মতিন ভাইকে দেশের ভিতরে পাঠানো হলো যাতে তাদের সমবয়সী যারা আছেন তাদেরকে সংগঠিত করে ভারতে নিয়ে যাবার জন্য। তখনো আমার সাথে মতিন ভাইয়ে সাথে যোগাযোগ হয়নি কিন্তু আমি চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে ভারত যাওয়া যায়, আমার কাছে কোন টাকা পয়সাও ছিল না, আমি ছাত্র মানুষ, জালকুড়িতে একটা বাড়িতে আমাদের কিছু চাল ছিল, সেখান থেকে আমি ২০ মণ চাল বিক্রি করি, সেই টাকা নিয়ে আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই, বর্তমানে যেটা সোনারগাঁও থানা, সেখানে গিয়ে আমি লঞ্চে উঠে রামচন্দ্রপুর যাই, রামচন্দ্রপুর যাওয়ার পরে সেখান থেকে বাঙ্গরা চারগাছ বাজার হয়ে যখন ভারতে যাইতে চেষ্টা করেছিলাম তখন কসবা যাওয়ার পরে সেখানে দেখলাম আর্মিরা মানুষদের উপর অনেক নির্যাতন করতেছে মানুষদের গুলি করতেছে বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমরা আর সেদিন যেতে পারলাম না, আমরা সেদিন ব্যাক করে আবার রামচন্দ্রপুর এসে থাকি, পরের দিন সকালে দেখতে পেলাম একটি লঞ্চ এসে থামল, লঞ্চ থেকে আমাদের তখনকার ছাত্রনেতা, যার নেতৃত্বে আমরা ছাত্র আন্দোলন করেছি, সেই মতিন ভাই সাথে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের নিয়ে সেখানে নামলেন। মতিন ভাই আমাকে দেখে বললেন কিরে তুই এখানে কেন, আমি বললাম আমি ভারতে যাব ট্রেনিং করবো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব, মতিন ভাই বললেন তোর বয়স কম তুই ছোট মানুষ তোকে নেয়া যাবে না তুই বাড়িতে চলে যা। মতিন ভাইকে তখন আমি বললাম, মতিন ভাই আপনি যদি না নেন তবুও আমি আপনার পিছনে পিছনে যাব আমাকে যুদ্ধে যেতেই হবে। তখন মতিন ভাই একটু সহানুভুতি হলো, চারিদিকে পাকিস্তানের আর্মি, তিনি আমাকে কোথায় ফেলে রেখে যাবেন, সে হিসেবে আমাকে তার সাথে ভারতে নিয়ে গেলেন। ভারতে আগরতলায় গেলাম সেখানে একটা ক্রাপস হোস্টেল ছিল সেই হোস্টেলের নেতৃত্বে ছিলেন ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের ক্যাম্প। সেখানে আমাদেরকে রিক্রুট করা হলো।

সেখানে দেখা পেলাম অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্ফার আহমেদ, কমরেড মণি সিংহ, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ছাত্রনেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহবুব জামান, মঞ্জুরুল হাসান খান, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেজ ওসমান সহ অনেকে আছেন সেখানে। ওই ক্যাম্পে আমরা কিছুদিন থাকার পরে আমাদেরকে বরদোয়ালী ক্যাম্পে পাঠানো হলো, সেই বরদোয়ালী ক্যাম্পে আমাদেরকে সাত দিনের ট্রেনিং দিল, সাতদিন পরে আমাদেরকে পাঠানো হল আগরতলা থেকে প্রায় ৯০ থেকে কিলোমিটার দূরে, সীমনা এলাকায় পঞ্চবটি নামক একটি স্থানে গরী জঙ্গলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা ক্যাম্প, সেখানে আমাদেরকে চিনিয়ে নিয়ে গেলেন যিনি তার নাম ছিল ক্যাপ্টেন রউফ, আমরা ৩৫ জনের মতো ছিলাম সে দলে। তার মধ্যে আমাদের এলাকার ছিলাম ৬ জন। আমি, আব্দুল মতিন, খোরশেদ ভাই, আলী হোসেন যিনি পরবর্তীতে আমাদের কমান্ডার হন, রওশন আলী এবং জয়নাল আবেদীন আমরা এই ৬ জন ছিলাম একই এলাকার। আমাদের যে ক্যাম্পে নেয়া হলো সেই ক্যাম্পের নাম ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি এবং সেটি ছিল ৩ নং সেক্টরের অধীনে এবং ওই ক্যাম্পের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম। যিনি পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিলেন এবং শপথ গ্রহণ করালেন, শপথ গ্রহণের পরে আমাদের প্রায় ১৫ দিন ট্রেনিং করালেন। আমাদেরকে ১৫ দিনের গেরিলা ট্রেনিং এ এক্সপ্লোসিভ, হ্যান্ড গ্রেনেড, স্মোক গ্রেনেড, এলএমজি স্টেনগান রাইফেল এসব অস্ত্রেও ট্রেনিং দেয়া হলো। এরপরে আমাদেরকে কিছু এক্সপ্লোসিভ দিয়ে পাঠানো হলো বাংলাদেশের ভিতরে নিজ এলাকায় স্থাপনা ধ্বংস করার জন্য। তখন আমাদের গ্রুপে আমরা প্রথম ৬ জন আসি, এই ছয় জনের মধ্যে আমাদের কমান্ডার ছিলেন আলী হোসেন, ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন আব্দুল মতিন, আমি ছিলাম, খোরশেদ আলম, জয়নাল আবেদীন এবং রওশন আলী আমরা এই ৬ জন জুন মাসের দিকে বাংলাদেশে আসি। এসে প্রথমে আমরা একটা অপারেশন করি, সেটা ছিল চিত্তরঞ্জন চৌধুরী বাসস্ট্যান্ডের একটি ট্রান্সমিটার উড়িয়ে দেবার। আমরা সেটি সফলভাবে উড়িয়ে দেই। তারপর

আমাদের আর একটা অপারেশন ছিল বার্মা স্ট্যান্ডে, সেখানেও একটা ট্রান্সমিটার উড়িয়ে দেয়া, এরপরের অপারেশনটা ছিল বিজেএমসিতে পাটের গুদামে আগুন দেওয়া, মাঝিপারা রেল ব্রিজ সেখান থেকে আদমজী পাটের মালামাল পাকিস্তানিরা আনা নেয়া করত, সেই যাতায়াত বন্ধ করার জন্য আমরা রেল ব্রিজটা ধ্বংস করি। এই রেল ব্রিজ ধ্বংস করার পরে আমাদের সাথে আমাদের এলাকার আরো ৯ জন যুক্ত হয়। এবং আবার তাদের নিয়ে ভারতে চলে যাই। আমাদের সেই নতুন ৯ জনের মধ্যে ছিল, ছাত্রনেতা কামাল ভাই, আব্দুল হামিদ, মহিউদ্দিন মোল্লা, মফিজ উদ্দিন, ফজলুল হক, বদিউল আলম, আলী আক্কাস, মহিউদ্দিন (যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তিনি বর্তমানে কানাডা প্রবাসী), আয়েত আলী গাজী। এদেরকে সাথে নিয়ে আমরা পুনরায় ভারতে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে যাই। তারা আমাদের সাথে যুক্ত হবার পর আমরা ১৫ জনের একটা গ্রুপ হই। এবার আমাদেরকে আবার এক মাসের ট্রেনিং দেয়া হয়, এক মাসের ট্রেনিং শেষে আমাদেরকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের ভিতরে এসে আমাদের এই বড় গ্রুপ নিয়ে আমরা আরো বড় বড় অপারেশন করা শুরু করি। এর মধ্যে আমাদের একটা বড় অপারেশন ছিল নলখালী ব্রিজ, যেটা ফতুল্লার কেরলিন মিল সংলগ্ন ব্রীজ, সেটা ছিল রেললাইন ব্রীজ সেটা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ টু ঢাকা থেকে রেলপথে আর্মিরা সব সময় যাতায়াত করতো এবং আর্মিদের রসদ, গোলাবারুদ, অস্ত্র এখান থেকে পার করতো, তাই নির্দেশ ছিল এই ব্রিজটা উড়িয়ে দেবার। এই অপারেশনে আমাদের প্রায় ৪০০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করতে হয়, আমরা সকলে মিলেই এই অপারেশনটা করি। সেই অপারেশনটা এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আমরা অপারেশনটায় একটা ট্রেনসহ উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। সেই অপারেশনে প্রায় ১৫ জন পাকিস্তানি সেনা মারা গিয়েছিল, কিন্তু এই অপারেশন এর পরের দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্ষোভে ফতুল্লা থেকে একেবারে আইটি হাই স্কুল পর্যন্ত, রাস্তার দুই পাশে সমস্ত বাড়ি ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিলো, এবং দুই থেকে আড়াইশ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করলো, এর প্রতিশোধ হিসেবে। আমাদের এই অপারেশনের কথা শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল

না, বিবিসি লন্ডন থেকে, ভারতের প্রতিটা চ্যানেল থেকে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করে আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবথেকে বড় অপারেশন ছিল এটা, আমি আমার গ্রুপের সাথে সর্বমোট সতেরোটি অপারেশন করি।

আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছিল বিজয় দিবসের দিন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ, যেদিন দেশ মুক্ত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে, সেদিন বিকেল চারটার সময় আমি, খোরশেদ আলম, এবং আয়েত আলী গাজী ভাই, আমরা তিনজনেই আমাদের গোদনাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে, চিত্তরঞ্জন মিলের গুদারাঘাটে আমরা যাচ্ছি, সেখান দিয়ে ভারতীয় আর্মিরা আমাদের এদিকে ঢুকতেছে, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য যাইতেছিলাম এমন সময়, গোদনাইল হাইস্কুল পার হওয়ার সময় একটা ছেলে দৌড়ে এসে আমাদেরকে বলল, জেএমসি ভিতরে পাকিস্তানি আর্মি আছে, এবং ওই আর্মিরা গুলি করতেছে, আমরা দাড়িঁয়ে গেলাম, কিছুক্ষণ পর আমরা শুনতে পেলাম ওরা ঠিকই গুলি করতেছে। ওদের কাছে যে অস্ত্র ছিল তা হলো জি-থ্রী রাইফেল। ওই অস্ত্রের আওয়াজটা ঠিক এমন ছিল "তাক ঢুম", দুইটা আওয়াজ হতো গুলি করলে। আমরা গুলির শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম এটা পাকিস্তানিরাই গুলি করতেছে। আমরা প্রথমে অনুমান করার চেষ্টা করলাম যে ওরা কোন অবস্থানে আছে। আমরা অনুভব করতে পারলাম একটা দোতলা বিল্ডিং আছে, সেই বিল্ডিং এর বারান্দা থেকে ওরা গুলি করতেছে। বিল্ডিংটা এমন পজিশনে ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা স্কুলের মতো এবং দুই দিক দিয়েই সিঁড়ি আছে। যে বারান্দা আছে তার মাঝখানে একটা দেয়াল এর মত করা, এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া যায় না। ওরা উত্তরের দিক থেকে সিড়িঁ দিয়ে উঠে গুলি করতেছে। আমরা তিনজন দক্ষিণ পাশের সিড়িঁ দিয়ে আস্তে আস্তে ক্রোলিং করে উপরে উঠলাম, উপরে উঠার পরে বারান্দার এক পাশে আমরা অন্য পাশে পাকিস্তানীরা, আমাদের পাশ থেকে খোরশেদ হাত দিয়ে ওদের দিকে গ্রেনেড থ্রো করতেছে আর আমি গ্রেনেড খুলে দিচ্ছি, এভাবে ওদের উপরে আমরা ১৫ থেকে ১৬ টা গ্রেনেড নিক্ষেপ করলাম, পাকিস্তানি আর্মিরা এত দক্ষ ছিল যে তারা গ্রেনেড

ছোড়ার পরে ব্লাস্ট হতে যে সময় লাগে তার আগেই ওরা গ্রেনেড ধরে নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এমন করে ওরা চার-পাঁচটা গ্রেনেড ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এবং বাকি গুলো ওখানে ফুটেছে। তখন আমরা খেয়াল করলাম কিছুক্ষণ পরে ওরা নিস্তেজ হয়ে গেছে, আমরা ভাবতে লাগলাম ওরা কি মারা গেল নাকি চুপ করে আছে, আমাদের মনে একটা ভয় কাজ করছে, এমন করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমাদের যুদ্ধ দেখে ভারতীয় মিত্রবাহিনীরা এখানে আসলো এবং এসে একটু দূর থেকে এলএমজি দিয়ে ওরা গুলি করা শুরু করলো, তখন আমরা সেভ পজিশনে চলে এলাম কারণ আমাদের গায়েও গুলি লাগতে পারে, আমরা সিগনাল দিলাম তাদের, তারা যেন গুলি না করে, ভারতীয় আর্মিরা গুলি করা বন্ধ করলো, এবং একটা হ্যান্ড মাইক দিয়ে ওদের কমান্ডার পাকিস্তানিদের আহ্বান করল তোমরা আত্মসমর্পন করো, তোমাদের পাকিস্তানি সকল আর্মিরা আত্মসমর্পন করে ফেলেছে তোমরাও আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করো, অনেকক্ষণ মাইকিং করার পরেও আর কোনো জবাব আসে না, তখন ভারতীয় আর্মিরা কয়েকটা স্মোক গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো, তাতে ধোয়া ধোয়া হয়ে গেলে আমাদেরকে তাদের কাছে নিয়ে আসলো এবং আমাদেরকে বলল তোমরা এখানে রাতে থেকো না যার যার অবস্থানে চলে যাও, ভারতীয় আর্মি ঢাকার দিকে গেল এবং আমরা জালকুড়ির দিকে চলে এলাম। জালকুড়িতে আমাদের কমান্ডার আলী হোসেন সহ আমরা সবাই থাকতাম একসাথে, তারপরে রাতে তো আমাদের আর ঘুম হয় না, আমরা ওখানে আর্মি রেখে এসেছি ওরা জীবিত না মৃত, ওরা কি করে আমরা কিছুই জানিনা, যাহোক রাত কাটল সকালে আমরা সবাই আবার আসলাম, আমরা চুপিসারে এসে ক্রোলিং করতে করতে ভিতরে ঢুকলাম, ভিতরে একটা বাথরুম ছিল, বাথরুমের দরজা খোলা, দেখলাম একটা পাকিস্তানি আর্মি উল্টো দিক ফিরে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যখন হোল্ড করালাম, তখন সে কম্পিত হয়ে গেল, তারপরে তাকে আমরা আটকালাম, আটকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমারা সাত কোন কোন হেয়। ও বলল মেরা সাথ দু আদমী হেয়, উপর ও দু আদমী মর গেয়া, তারপরে আমরা উপরে উঠে দেখি, আমরা গতকালকে যে গ্রেনেড চার্জ করেছিলাম সে গ্রেনেডের

আঘাতে তারা মারা গেছে। ওদের সকলের আর্মস গুলো আমরা নিয়ে নিলাম, আর যে দুইটা মারা গেছে তাদেরকে দেখিয়ে জেএমসি যে সুইপার ছিল, তাদেরকে বললাম তোমরা শীতলক্ষ্যা নদীতে এই লাশ গুলো ফেলে দাও, আর যে জীবিত তাকে আমরা ধরে সাথে নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসার সাথে সাথে এলাকার লোকজন দেখতেছে আমরা পাকিস্তানি আর্মি একটা ধরে নিয়ে আসছি, এটা এক আনন্দের বিষয়, সেই পাকিস্তানি আর্মিটা তখন শ্লোগান দিতেছিল ইন্দ্রা গান্ধী মেরা মা হায়, শেখ মুজিব হায়, সে ভয়ে এইসব কথা বলতেছিল, আমরা যখন তাকে ধরে নিয়ে জালকুড়ি যাচ্ছি, আমাদের দুই নম্বর ঢাকেশ্বরী বাসস্ট্যান্ডে আনার পরে আমাদের এলাকার এক মুরব্বী তিনি এখন আর বেঁচে নেই, হাজী মফিজ উদ্দিন সাহেব, উনি আমাদেরকে বললেন এই তোমরা দাড়াও, আমরা বললাম কি ব্যাপার কাকা। তিনি বললেন একটু দাড়াও, আমরা দাঁড়ানোর পর তিনি তার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে পাকিস্তানি আর্মির গালে একটা বাড়ি মারলেন তার স্যান্ডেল দিয়ে, এবং সেই কাকা বললেন আমার ওয়াদা ছিল পাকিস্তানিদের পাইলে আমি আমার জুতা দিয়ে তাদেরকে পিটাবো। এমনভাবে অনেক মানুষ থুতু দিতেছে, কেউ থাপ্পর দিতেছে এভাবে অনেকেই ক্ষোভ এবং উল্লাস প্রকাশ করতেছে, আমরা পাকিস্তানি আর্মিটাকে নিয়ে জালকুড়ি গেলাম এবং রাতে তাকে মেরে ফেলা হয়। আমরা জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলে শ্লোগানে মুখরিত ছিলাম। এটা ছিল আমাদের জীবনে একটা বিরল ঘটনা। বিজয় দিবসের দিনে দেশ স্বাধীন করেও আমরা বিজয়ের উল্লাস করতে পারিনি। ওদের সাথে যুদ্ধ করা লাগছে।

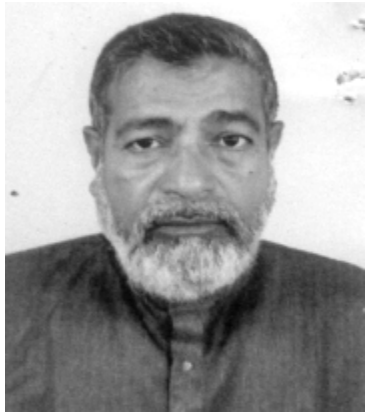

বীর মুক্তিযোদ্ধা

শেখ শওকত হোসেন, বাগেরহাট

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সারাদেশ উত্তাল,বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ক্রমে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। হঠাৎ ২৫শে মার্চ কাল রাতে পাকহানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর। পিলখানা, বিডিআর হেড-কোয়াটার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে হাজার হাজার বাঙ্গালি, তখনি প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিডিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ছাত্র জনতা। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গানবোর্ড প্রবেশ করে বাগেরহাট নদীতে। বাগেরহাট শহর হতে আমার এলাকা সিংগা খেয়াঘাট পযর্ন্ত পৌছে শুরু করে ব্যাপক গোলা বর্ষন। হতাহত খুব একটা না হলেও গোলার আঘাতে দালানের ছাদ ধসে এক বৃদ্ধা মহিলা মারা যায়। এলাকার মানুষের আতঙ্ক আরো বেড়ে যায়। এদিকে বাগেরহাট শহরে মাওঃ ইউসুব, রজব আলী ফকির, মোসলেম ডাক্তার, শেখ এসহাক গং এর নেতৃত্বে গঠিত হয় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অন্যতম দোসর রাজাকার বাহিনী। বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় রাজাকার বাহিনীর অপারেশন। এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম বাগেরহাটের উত্তর বিষ্নুপুর এলাকায় শেখ রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং চিরুলিয়া হাই স্কুল মাঠে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর ঐ এলাকার জনৈক রাঙ্গা বাবুর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি ও অস্ত্র

সংগ্রহের কাজ জোড়েসোড়ে শুরু হয় এবং বাগেরহাট শহর হতে রাজাকাররা যাতে ঐ এলাকায় অপারেশন করতে না পারে সে জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আমি জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বে ঐ ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি এবং সুবেদার তাইজুল ইসলামের নিকট অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সর্বপ্রথম কচুয়া থানাধীন মাধবকাঠি মাদ্রাসার যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করি। রাতভর যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি গানবোর্ড এসে হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকারদের ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং পাক-হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের ধংসযোগ্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন বিষ্ণুপুর হতে ক্যাম্প প্রত্যাহার করে বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের খালিশপুর গ্রামে নৃপেন হালদার এর বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। হঠাৎ করে সংবাদ আসে পাকহানাদার বাহিনী ও দোসররা বিষ্ণুপুর এলাকায় অপারেশন করতে আসছে। তখনই আমরা সুবেদার তাইজুল ইসলাম ও ইসমাইল হোসেন ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ আমি সহ বাবুরহাটের দিকে রওনা হই। বাবুরহাট বাজারের নিকট পৌছে দেখি বাবুরহাট বাজার ওদের দেওয়া আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তখন আমরা একেবারে বাজারের নিকটে পজেশন নেই এবং কাছে থাকা রাইফেল দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করি। একপর্যায়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ন এবং ওদের ধরার জন্য চারঘাটা নামক স্থানে পুনরায় এ্যমবুশ গ্রহণ করি। উদ্দেশ্য ওদের বহনকারী "শৈকত" নামীয় লঞ্চটি অকেজো করে ওদের আত্মসমর্পণ করানো। কিন্তু আমাদের অবস্থান বুঝতে পেরে ওরা লঞ্চ যোগে না এসে গোটাপারার পথ ধরে হেটে মুনিগঞ্জ পৌছায়। এদিকে আমরা ওদের খালি লঞ্চ টিতে গুলিবর্ষণ করে অনেক ক্ষতিসাধন করি। কিন্তু লঞ্চটির ভিতরে থাকা লোকজনের কোন খোজ খবর আমরা পাই নাই। যুদ্ধ শেষে আমরা খালিশপুরের ক্যাম্পে ফিরে আসি। এদিকে আমাদের এলাকার অনেক যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লক্ষে ভারতে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য গমণ করে। তখন আমি সহ আরো কয়েক জন উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ক্যাম্পের টুআইসি জনাব আনিছুর রহমানের সাথে পরামর্শ করে একটি গ্রুপ নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকায় প্রচার করি এবং এক

সংগে ১০২/১০৫ জন ভারতে গমণ করি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট শহরে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং ক্যাম্প এ তৎকালিন এমপি শেখ আব্দুর রহমান এর মাধ্যমে যোগদান করি। কিছুদিন টাকি ক্যাম্পে থাকার পর বিহারে চাকুলিয়া ক্যাম্পে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য গমণ করি। এক মাস উচ্চ প্রশিক্ষণের পর পুনরায় বেগুনদিয়া রেষ্ট ক্যাম্পে ফিরে আসি। কয়েকদিন ভারতীয় বি,এস,এফ-এর সাথে সিমান্ত পাহারায় অংশগ্রহণ করি। পরে পিরোজপুরের মেজর জিয়া উদ্দিনের নেতৃত্বে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় শরনখোলা সহ বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করি এবং একযোগে মেজর জিয়া উদ্দিনের নেতৃত্বে রায়েন্দা বাজারের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি। সেখানে আমাদের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ হন। উল্লেখ্য আছাদ, টিপু, আলাউদ্দিন সহ অনেকে। আমরা যুদ্ধে শত্রুদের আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করি এবং আমরা বিজয় অর্জন করি। এদিকে এর অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মিত্র বাহিনীর নিকট ১৬/১২/১৯৭১ ইং তারিখে আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মো. রফিকুল ইসলাম নান্নু,
বরিশাল

আমি ভারতের (বিহার) এর চাকুলিয়া বর্তমান ঝাড়খন্ড-এ ভারতীয় সেনার অধিনে গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আমার বাবা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ এবং লাইব্রেরিয়ান। তিনি বরিশাল শহরে বই-এর ব্যাবসা করতেন। তিনিই আমার রাজনীতির শিক্ষাগুরু। তিনি শেরএ বাংলা এ.কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং মাওলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাষানী এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই দেশপ্রেম এবং দেশত্ববোধ আমার মনে রেখাপাত করে। শেখ মুজিবর রহমান যখন ১৯৬৮ সালে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি হন তখন ছাত্র-জনতা একত্র হয়ে তাঁর মুক্তির দাবীতে রাস্তায় নামে। আমি তাঁদের একজন হয়ে মিছিল মিটিং এ অংশ নিয়েছিলাম। আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবর রহমান মুক্তি পান। এলো '৭০ এর নির্বাচন, ৯৮% বিজয় হয়। আমার বাবা বলতেন- এবার বাঙ্গালিদের পাওয়ার প্রচেষ্টা সফল হবে। '৭০ এর নির্বাচনের পরেও পাকিস্তানি শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করে। বাবা বললেন- "যে পরিস্থিতি পাকিস্তানী শাসক বাঙালিদের হাতে কোন ক্রমেই ক্ষমতা দেবে না। তাই নানান টালবাহানা করছে" সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। '৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা দিলেন। তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। আরও বললেন- তোমাদের যা

কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্”। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু অস্ত্র কোথায়? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানীরা রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, পিলখানা, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্রাবাসে আক্রমণ করে গণহত্যা চালায়। বরিশালে খবর আসে, তখন বরিশালের এমপি জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই। আমির হোসেন আমু ভাই, মহিউদ্দিন ভাই, পিরোজপুরের সামছুল হক সাহেব আরও অনেকে বরিশাল একত্র হয়ে বরিশাল সদর গার্লস স্কুলে অস্থায়ী সচিবালয় গঠন করেন। মেজর এম.এ. জলিল সাহেব এসে যোগ দিলেন। শুরু হলো যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি। বরিশাল পুলিশ লাইন থেকে সামান্য কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হলো। জলিল ভাই এর নেতৃত্বে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা ট্রেনিং এর জন্য প্রস্তুত। আমি এবং আমার এক বন্ধু দুজনেই সদর গার্লস স্কুলে গিয়ে যোগ দেই। মেজর জলিল ভাই সকলকে লাইনে দাড় করিয়ে সকলের স্বাস্থ্য পরিক্ষা করে একে একে কিছু লোক আলাদা করলেন। আমাকে বাদ দিলো। বলল- তোমার বয়স কম, তাছাড়া শারীরিক দিক থেকে দূর্বল, তুমি পারবে না। আমার বন্ধু জিয়াউলও লাইন থেকে বেড়িয়ে এলো। ওর কথা যা-ই কিছু করি দুইজন একত্রেই করবো এবং একত্রেই থাকবো। এরপরে বরিশাল ল’কলেজের মধ্যে একটা টিনের ঘরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একটা গ্রুপ ছিল। তাদের সাথে যোগ দেই। হাতে বানানো কিছু ককটেল, গ্রেনেড ছাড়া কোনো অস্ত্র আমাদের কাছে ছিল না। ২৬ এপ্রিল ভোররাতে তিন দিক থেকে বরিশালে পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করে। তালতলী ঝুনাহার এলাকা দিয়ে নৌপথে গানবোট নিয়ে লাকুটিয়া এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে এবং সড়কপথে মাদারীপুর হয়ে বরিশালে আসে। মেজর জলিল ভাই এবং মঞ্জু ভাই এর নির্দেশে আমরা বরিশাল শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে গেলাম। যেহেতু পাকিস্তানী সেনাদের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের কাছে ভারী কোনো অস্ত্র ছিল না। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের গ্রুপের সাথে আমি এবং জিয়াউল হক বাবুগঞ্জের দিকে চলে যাই। সেখানে এলাকার লোকজনের চিৎকারে জানতে পারি খান সেনারা আক্রমণ করেছে। এলাকার

সকলে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। আমরা আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। পরে কে কোথায় কাউকেই খুঁজে পেলাম না। প্রায় তিন দিন পথে পথে ঘুরে হরিণাফুলিয়া মীরা বাড়ি আমার মায়ের নানাবাড়ি এসে পৌছাই। বরিশালে হানাদার বাহিনী দখল নেয়। আমার বাবা, মা, ভাই-বোন মীরাবাড়িতেই ছিল। ১০/১৫ দিন সেখানে অবস্থান করার পর আমার বাবা-মা সহ আবার বরিশালে ফিরে আসি। তখন শহরের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক। তবে খান সেনাদের হামলা গণহত্যা চলমান। আওয়ামী লীগের নেতাদের বাসায় বাসায় হামলা চালাতো সন্দেহজনক কেউকে পেলে ধরে নিয়ে যেতো। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটতো। বরিশাল শহরে ফেরার পর আবার নতুন করে আমি এবং আমার বন্ধু জিয়াউল মিলে অন্যান্য বন্ধুদের সংগঠিত করার চেষ্টা করি। দুই-একজনকে পেলেও তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে যেতে চায়নি। যদি দেশ স্বাধীন না হয় তবে তারা আর দেশে ফিরতে পারবে না। শহরে এসে আমি একটা হিন্দু পরিবার কে সুধীর কুমার সেন এর স্ত্রী ও বোন সুবর্ণ দি কে শহর থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করি। আমার মায়ের বোরখা এবং আমার প্রতিবেশীর বোরখা সংগ্রহ করে তাদের গুঠিয়া পর্যন্ত পৌছে দেই। তার পরের দিনই রাত আনুমানিক-১১.৩০/১২.০০ টার দিকে আমার বাসা পাকিস্তানী সেনা ঘিরে ধরে এবং আমাকে ধরে নিয়ে যায়। পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকলেও চেষ্টা করিনি। পালিয়ে গেলে হয়তো আমার বাবাকে মেরে ফেলতো, বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিত। দুই দিন অমানুষিক নির্যাতন, হাত বেধে উপরে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে পিটাতো, পায়ের তলায় শরীরের বিভিন্ন যায়গায় পিটাতো, তাদের প্রশ্ন, মুক্তি কিধার? আমার সাথে কে কে আছে? আমাদের কাছে কি অস্ত্র আছে এবং কোথায়? অত্যাচারে মাঝে মাঝে বেহুস হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার সাথে কারো যোগাযোগ ছিলনা যে কারণে কিছুই বলিনি। দুইদিন পরে বেলুচ রেজিমেন্টের এক ক্যাপ্টেন এলো জানতে চাইলো আমার সাথে কে কে আছে? হিন্দু পরিবারকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি, বাংলা উর্দ্ধ মিলিয়ে তাকে বুঝাতে পারলাম, আমার বয়স কম শরীরের অবস্থা দুর্বল, আমার পক্ষে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, আমি মুক্তিফৌজে যোগ দেইনি, নানা মিথ্যে কাহিনী বলে তাকে বুঝাতে সক্ষম হই। তিনি তার

সিনিয়র অফিসার কে বলে আমাকে মুক্ত করে দেয়। মুক্তির স্বাদ যে কি তা তখনি বুঝতে পারি, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে আবার আমার বন্ধু জিয়াউলের সাথে যোগাযোগ করি। বন্ধুর বাবা ছিল বরিশালের ডিস্ট্রিক এ্যডুকেশন অফিসার। তিনি বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষকদের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারে ফরিদপুরের ওরাকান্দি ঠাকুরবাড়ি থেকে হাজার হাজার লোক ভারতে যাচ্ছে। যদি আমরা ঐ ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত যেতে পারি তবে সেখান থেকে ভারতে যেতে তেমন কোন অসুবিধা হবে না। আমরা দুই বন্ধু রাতে বাসায় থাকতাম না। বন্ধুর বাবার অফিসে রাত কাটাতাম, দিন হলে সকলের সাথে যোগাযোগ করতাম। ভারতে যাবো প্রস্তুতি নিয়ে বাসায় এলাম পরিবারের সাথে রাতের খাবার খাবো বলে। বাবা প্রচন্ড বকাবকি করলো। কেনো এখনো শহর ছাড়ছিনা? সামনে থেকে খাবারের থালা নিয়ে গেলো। বলল আগে বলবি শহর ছাড়বি কিনা? তারপর খাবি। মনে কষ্ট পেলাম, সামনে থেকে খাবার সরিয়ে নেয়ার জন্য। খাওয়া হলো না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বাবা-মার সাথে শেষ দেখা। বন্ধুর বাসায় গিয়ে বন্ধুকে নিয়ে রাত কাটালাম তার বাবার অফিসে। ভোরে ফজরের আজানের আগেই শহরের অলিগলি দিয়ে শহর ছাড়লাম। মাধবপাশা, বানারিপাড়া, সরূপকাঠি হয়ে শেষ অবধি রাতে ওরাকান্দি ঠাকুরবাড়ি পৌছেছি। সেখানে গিয়ে দেখি হাজার হাজার নারী পুরুষ জমায়েত হয়েছে ভারতে যাবার জন্য। কোথাও বসার জায়গা নেই। ঠাকুরবাড়ি মন্দির থেকে সকলের খাবার ব্যবস্থা করেছে। আমাদেরও খাবার দিল। সমস্ত দিন না খাওয়া। ক্ষুধার্ত পেটে অমৃত মনে হলো। রাতে একটা নৌকায় বসে সময় পার করলাম। রাত চারটার দিকে ডাক এলো যারা যারা ভারতে যেতে চান তারা সকলে তৈরী হয়ে নৌকায় ওঠেন। আমরা নৌকায়ই ছিলাম। চারিদিকে পানি আর পানি। বিল এলাকা, তাই এলাকাটা অনেকটা নিরাপদ। ফরিদপুর থেকে যশোরের গঙ্গারামপুর হয়ে সিমান্তের দিকে এগুচ্ছি সাথে গাইড আছে। পথে পথে গাছের সাথে দিক নির্দেশ করা আছে সিমান্তের দিকে। এভাবে ৪দিন পরে বাগধা বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। একটি আম বাগান ৪/৫ টা টং দোকান চা, রুটি, গুড়, চিড়া, মুড়ি নিয়ে বসে আছে, ছোট একটা তাবু খাটানো সেখান থেকে বর্ডার

স্লিপ নিলাম, ভাগ্যক্রমে সেখানেই দেখা হয়ে গেল মানিক ভাইয়ের সাথে। তার পুরা নাম মুর্তজা রহমান মানিক, গালে একটা তিল থাকায় তাকে তিলা মানিক ভাই বলতাম। আমার অনেক সিনিয়র, মুঞ্জু ভাইয়ের সাথে সে অনেক আগেই ভারতে গিয়েছে। তার সাথে দেখা হওয়ায় নিশ্চিন্ত হয়েছি। ভারতের মাটিতে অন্তত ১ জন পরিচিত পেয়েছি। মানিক ভাই আমাদের নাস্তা খাওয়ালো এবং একটা চিঠি লিখে হাসনাবাদে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে দেখা করতে বললো। ঐ দিনই মঞ্জু ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। রাতে ওখানেই ছিলাম। বাসায় হাজার হাজার লোক, থাকার জায়গা নেই। রাতে একটা চায়ের দোকানে বসে বসে রাত কাটালাম। পরের দিন মানিক ভাই এলো, আমাদের টকিপুর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। শুরু হলো যুদ্ধের জীবন। ক্যাম্পের জীবন খুব একটা আরামদায়ক ছিল না। পুরো ক্যাম্পে কাঁদা, খড়-কুটা, লতাপাতা বিছিয়ে তার উপর ত্রিপলের উপর মাথার নিচে ইট দিয়ে ঘুমাতে হতো। কিছুদিন ক্যাম্পে থাকার পরে ডাক এলো ট্রেনিং এর জন্য ভারতের (বিহার) চাকুলিয়াতে পাঠানো হলো। ৫টি বাসে রাত ৪টার সময় যাত্রা শুরু করলাম। মাঝপথে যাত্রা থামিয়ে নাস্তা করলাম কলা-রুটি, দুপুরেও খাওয়া হলো কলা-রুটি, রাতেও ঐ একই খাবার। সমস্ত দিন গাড়িতে, রাতে গাড়ির চালক বলল সে আর গাড়ি চালাতে পারছে না ঘুমের কারণে। গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে গাড়ি থামিয়ে যাত্রা বিরতি। কেউ রাস্তার পাশে কেউ রাস্তার উপরেই শুয়ে রাত কাটালাম। পরের দিন আবার যাত্রা শুরু দুপুরে চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌছাই। সেখানে তাবু ছিল না, আমাদের নিজেদের তাবু খাটাতে হয়েছে। ভারতীয় সেনারা আমাদের সহায়তা করেছে। লাল পাথর বিছানো মাটি যা আমি বরিশালে কখনও দেখিনি, তাবু খাটানোর পর তাবুর চারিদিকে ড্রেনের মত করে গভীর খাদ কাটতে হলো, কারণ পাহাড়ি এলাকা, এখানে বিষাক্ত সাপের আনাগোনা বেশী। প্রতিদিন সকালে দেখতাম খাদের মধ্যে ৪/৫ টা সাপ পরে আছে। বিকেলে মেডিকেল চেকআপ হলো এবং আমাদের প্রত্যেককে ১টা সতরঞ্চি, ২টা শার্ট, ২টা গেঞ্জি, দুইটা সর্ট প্যান্ট, ২টা ছোট গামছা, ১টা থালা, ১টা মগ এবং ১ জোড়া সেনাবাহিনীর জুতা দিল যা ভারতীয় সেনারা যুদ্ধের মাঠে ব্যবহার করে। এসব কিছু রাখার জন্য একটা

মিলিটারী ব্যাগ দিল যা ফিতার সাহায্যে পিঠে বেধে রাখা যায়। প্রথম তিন সপ্তাহ বিভিন্ন অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হলো। শেষ সপ্তাহে এক্সপ্লোসিভ, বিভিন্ন প্রকার মাইন, ২" মর্টার, ৩" মর্টার, রকেট লাঞ্চার, এনারগান ব্যবহারের কৌশল প্রশিক্ষণ হয়। ২৮দিন আমাদের ট্রেনিং হয় ট্রেনিং শেষে আবার আমরা হাসনাবাদ এলাকায় অপারেশন ক্যাম্পে ফিরে আসি এবং ১সপ্তাহ বিশ্রাম করার সুযোগ পাই। ক্যাম্পে অবস্থানকালে অনেকেই চক্ষুরোগ এবং চুলকানির রোগে আক্রান্ত হই। এই রোগের নাম দিয়েছিলাম জয়বাংলা রোগ। তবে একটা কথা না বললেই নয়। চাকুলিয়াতে আমার ব্যাচে বরিশাল শহরের অনেকেই ছিল। একই সাথে আমরা ট্রেনিং নেই। তার মধ্যে আমার বন্ধু জিয়াউল হক, শেখ কুতুবউদ্দিন, প্রদীপ কুমার ঘোষ, পুতুল দা, পরিমল ঘোষ, তারেক নুরুল্লাহ, আফজাল হোসেন, মোঃ তোফাজ্জল হক, খোকা চৌধুরী, তসলিম-বিন-আজম, প্রবাল দা, আঃ ছালাম, খুলনার আব্দুস ছালাম, মোঃ নুর আলী (তার বাড়ি পারুলিয়া সাতক্ষীরা) আরও অনেকে যাদের সকলের নাম আজ মনে নেই তবে এদের বেশির ভাগই পূর্বের পরিচিত ছিল। চাকুলিয়াতে ট্রেনিং এর জন্য ২৯-০৭-১৯৭১ইং তারিখ পৌঁছাই। ৯নং উইং এবং ব্যাচ নম্বর ৪। ট্রেনিং এর সময় একটা হলুদ কার্ড দিয়েছিল। সেখানে আমার নম্বর ছিল ৩৪৮৩। আমার বন্ধুর নম্বর ছিল ৩৪৮৪। বিশ্রাম শেষে বরিশালের চাকুলিয়া ট্রেনিং প্রাপ্ত সকলে নবম সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোঃ মাহফুজ আলম বেগ সাহেবের নেতৃত্বে ভারতের লোকালয়ের শেষ সিমানায় ইছামতি নদীর পাড়ে শ্যামসেরনগর ক্যাম্পে চলে যাই। প্রায় ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপ। শ্যামসের নগরের ওপারেই সাতক্ষীরা এলাকায় বেগ ভাই এর উপর দায়িত্ব ছিল সাতক্ষীরা এলাকা মুক্ত করা। সাতক্ষীরা সহ পারুলিয়া ব্রীজ অপারেশন শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, ভেটখালী, কৈখালী, হড়িনগর, মুন্সিগঞ্জে আমরা বেগ ভাই এর নেতৃত্বে অনেক সফল অপরেশন করি সেখানে উল্লেখযোগ্য ১১জন রাজাকার বন্দি করি এবং তাদেরকে হত্যা করি। ২০ নভেম্বর কালিগঞ্জ থানা মুক্ত করি বাংলাদেশে সর্ব প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তলন হয়। বিশেষ করে ঐ দিন ছিল ঈদের দিন। অতপরঃ মেজর এম-এ জলিল ভাই এর নির্দেশে বরিশালের উদ্দেশ্যে ১টি লঞ্চ ও অনেক

গুলি নৌকা সহ রওয়ানা হই এবং ডিসেম্বর এর ১৭ তারিখে বরিশালে পৌঁছাই। ৮ডিসেম্বর বরিশালে কারফিউ দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের দোসরদের অনেকেই পালিয়ে যায়। কিন্তু এলাকার রাজাকার বাহিনী এবং তাদের সাথীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড ওয়াপদায় অবস্থান নেয়। ঐ দিনই তাদের আত্মসমার্পণ করাই, পরেরদিন শিকারপুরে ক্যাপ্টেন কাহারের নেতৃত্বে ১ কোম্পানী পাকিস্তানি সেনা অবস্থান করছিল। তাদের আত্মসমার্পণ করানো হয়। এই সকলই ক্যাপ্টেন বেগ ভাইয়ের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। যুদ্ধ শেষে দেশ শত্রু মুক্ত হলো। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারী দেশে ফেরার পর অস্ত্র জমা দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। আমরা ক্যাপ্টেন বেগ ভাইয়ের নেতৃত্বে লঞ্চ নিয়ে ঢাকা গিয়ে ইউনিভার্সিটির জিমনেসিয়ামে অবস্থান নিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হলো না। তিনি এক সেনা অফিসারকে দায়িত্ব দিলেন অস্ত্র জমা নেয়ার জন্য। অতপরঃ সেনা অফিসার এর কাছেই অস্ত্র জমা দিলাম। আমরা অস্ত্র জমা দেয়ার পরে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি, আনন্দ করছি এর মধ্যে জানুয়ারীর শেষ দিকে বেগ ভাই এসে জানালো আবার যুদ্ধ করতে হবে, মীরপুর ১১ নম্বরে বিহারি, রাজাকার এবং কিছু পাকিস্তানি এলাকা দখলে রেখেছে, তারা আত্মসমার্পণ করেনি, বেগ ভাইয়ের নেতৃত্বে আবার অস্ত্র সংগ্রহ করে ৩১ জানুয়ারী মীরপুর শত্রু মুক্ত করে আবার অস্ত্র জমা দিয়ে ঘরের ছেলে খালি হাতে ঘরে ফিরে আসি, খালি হাতে যুদ্ধে গিয়েছিলাম আবার খালি হাতেই ঘরে ফিরলাম, মাঝখানে পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন দেশ যা হবে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, শোষণ মুক্ত, সবার সমান অধিকার, শান্তিতে ঘুমাতে পারবো, মোটা ভাত মোটা কাপড় অন্তত পাবো। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আমার কথা

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনায় এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার একটাই উদ্দেশ্য যুদ্ধে আমার মৃত্যু হোক। আমার মত হাজার হাজার আরও গরীব অসহায় পরিবার শোষণ মুক্ত দেশে ভালোভাবে শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরী পাবে পরবর্তী প্রজন্ম

ভালোভাবে জীবন যাপন করবে। পাকিস্তানিদের শোষণের নাগপাস থেকে মুক্ত হবে। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা মুক্ত স্বাধীন দেশে বসবাস করবে। অথচ কি পেলাম? ২০১৭ সালে এক দুর্ঘটনায় আমার হাতে এবং কোমরে আঘাত পাওয়ায় আমি কর্মহীন। বাবা শেষ জীবনে অসুস্থ থাকায় জায়গা জমি যা ছিল চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিক্রি করতে হয় বাকি যা ছিল তাও নদীতে বিলীন হয়। বর্তমানে শহরে বাবার করে যাওয়া ছোট একটি বাড়ি, সেখানে ওয়ারিশ সূত্রে মাত্র ৩/৪ শতাংশ জায়গা পেয়েছি। সেখানেই স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের ২০,০০০/- বিশ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। এই ভাতার টাকার উপরই চিকিৎসা, ঔষধ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া এবং সংসারের খরচ চালাতে হিমসিম খেতে হয়। দেশ স্বাধীন করেও সত্যিকারের স্বাধীনতার সুখ পেলাম না। মুক্তিযুদ্ধ করে আমাদের কিছু চাওয়া পাওয়া ছিল না, ৩০ লক্ষ শহীদ, প্রায় ২লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর বিনিময় যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলেও সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের কথা উল্লেখ নাই এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাংবিধানিক কোন স্বীকৃতি নাই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

- যে ব্যক্তি যত সৎ তার কষ্টও তত বেশি।
- বিশ্বাস আর নিশ্বাস হারিয়ে গেলে ফেরৎ আসে না।
- মানুষ বিপদে পড়লে বোঝা যায় পৃথিবীটা কত কঠিন, কে আপন কে পর চেনা যায়।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে মানুষ চেনা।
- সুন্দর বন আর সুন্দর মন দুটোই বিলুপ্তির পথে।
- পরের উপকার করা ভালো কিন্তু নিজেকে পথে বসিয়ে নয়।
- অহঙ্কার তারাই করে যারা হঠাৎ করে কিছু পেয়ে যায়, যা তার পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না।
- লেবু বেশি চিপলে যেমন তেতো হয়ে যায় তেমন কেউকে বেশি ভালোবাসলে তার অহঙ্কার বেড়ে যায়।
- স্বার্থপর লোকগুলো কখনোই দুঃখের ভাগ বহন করে না।
- পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রাণী হচ্ছে মানুষ, নিজেদের প্রয়োজনে সব কিছু করতে পারে।
- এমন বন্ধুত্ব না করাই ভালো, যা সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যায়।
- পৃথিবীতে সব থেকে নিকৃষ্ট সে, যে গরিবের হক মারে।
- সব কথা ভুলে যেতে নেই, সময় বুঝে ফেরত দেওয়ার জন্য হলেও কিছু কথা মনে রাখতে হয়।

▶ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা যদি দুইপক্ষেরই থাকে, তবে সেই সম্পর্ক কেউ ভাঙতে পারে না।